হৃদয়ের প্রশান্তি
জিকরুল্লাহ
ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

হৃদয়ের প্রশান্তি

জিকরুল্লাহ

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

খানক্কায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

হৃদয়ের প্রশান্তি

জিকরুল্লাহ

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

ইন্টারনেট সংস্করণ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
গবেষণা বিভাগ
আলী সেন্টার, সিলেট, বাংলাদেশ।
engineerazizulbari@gmail.com

সূচি

بسم الله الرحمٰن الرحيم

ভূমিকা

نحمده ونصلى علٰى رسوله الكريم وعلٰاله وأصحابه أجمعين -

আম্মাবাদ, আল্লাহ্ পাক তাঁর পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"আলা বিজিকরিল্লাহি তাতমায়িন্নুল কুলুব" -'আল্লাহর জিকিরেই চিত্ত হয় প্রশান্ত'।

আজকের এই বহুতরের ফিতনার যুগে জিকির সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা একান্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতে অনেক লেখক, সুফি, দরবেশ ও অলিআল্লাহ্ ইলমে তাছাওউফ তথা ইসলামের আধ্যাত্মিকতা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি করেছেন। কিন্তু আজকাল তেমন বেশী লেখা হয় না। ইলমে তাছাওউফ কী, কেন এবং এর হাক্বীকতই বা কী, এ সম্পর্কে লেখালেখির আকাল থাকায় সাধারণ মানুষের অনেকেই বিভ্রান্ত হচ্ছেন। এছাড়া শরীয়তের অভ্যন্তরস্থ ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইলমী শাখা 'ইলমে মা'রিফাত' নিয়ে কিছু কিছু গোষ্ঠি একেবারেই অহেতুক বাড়াবাড়ি করছেন। এমনকি এদের অনেকে এরূপ কোন শাখা আছে বলে স্বীকারই করেন না!

সালাফী নামধারী একদল লোক বলে বেড়ায়, যারা বসে বসে সশব্দে কিংবা একাধিক লোক একত্রে বসে জিকির পড়ে তারা ভ্রান্ত। জিকির, তাসবীহ্, দরূদ পাঠ ইত্যাদি জোরেসুরে পড়া কারো কারো মতে বিদআত। তারা বলেন, এসব পড়তে হবে ধীরে ধীরে এবং নিঃশব্দে। অন্যরা বলে, জিকির বেশী করার চেয়ে টাকা তুলে জিহাদে অংশগ্রহণ অনেক ভালো। কেউ কেউ বলেন, বাতি নিভিয়ে জিকির পড়া ঠিক নয় এবং একদল আছেন, যারা শুধু 'আল্লাহ' নামের জিকির পছন্দ করেন না! তাদের মতে 'ইয়া আল্লাহ' বলতে হবে। অপর আরেক দল বলেন, তাসবীহ পাঠে গোটাযুক্ত তাসবীহ তৈরী করে গণনা করা বিদআত। এরূপ বহুতরের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে সর্বোচ্চ এই ইবাদাত জিকিরকে নিয়ে।

এদের দাবী-দাবা যে মূলত ভিত্তিহীন, তা এই গ্রন্থে কুরআন-হাদীস ও গুণীজনদের বক্তব্যের আলোকে প্রমাণ করা হবে ইনশাআল্লাহ। এটা পাঠ করার পর সত্যিকার হক্বপন্থীরা আশাকরি সব ধরনের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর পবিত্র নামের জিকিরে নিজেদেরকে নিমজ্জিত করবেন। আমি আল্লাহর দরবারে তাওফিক কামনা করছি এবং ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
এপ্রিল, ২০১১ ঈসায়ী।

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমিনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহামতুল্লাহি আলাইহির ইশারায় এবং সিলেট শহরের সুবিদা বাজারে স্থাপিত 'আলী সেন্টার' মার্কেটের প্রতিষ্ঠাতা হাজী আলী আসগর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশে ও বর্তমান মালিক অত্র কিতাবের রচয়িতা ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারীর উদ্যোগে স্থাপিত **'খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী'** থেকে অত্র গ্রন্থখানা পাঠকদের হাতে তুলে দিতে আমরা সক্ষম হয়েছি। আল্লাহর জিকির ছাড়া কোন মুসলামই পাপের কারণে সৃষ্ট হৃদয়ের মরিচা দূর করতে সক্ষম হবেন না। আর আমরা সবাই তো পাপের মধ্যে ডুবে আছি। তবে জিকরুল্লাহর সঠিক পদ্ধতি ও এ থেকে বৃহৎ উপকার হাসিল করার পথ হলো তাসাওউফ চর্চা। এই চর্চাকে আমাদের দেশে পীর-মুরীদি বলে। আর এই পদ্ধতি অবলম্বন করেই অতীতে অসংখ্য ওলি-আল্লাহ এবং গউস-কুতুব আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। পৃথিবীতে জীবিতাবস্থায় এরূপ অনেক ওলিআল্লাহ বিদ্যমান আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন।

বর্তমান বহুতরের এ ফিতনার যুগে কিছু চিহ্নিত গোষ্ঠি **'জিকরুল্লাহ'** সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের বিভ্রান্ত ছড়িয়ে মানুষকে এ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। এসব লোক মূলত তাসাওউফ বিরোধী। তবে তাসাওউফের বিরুদ্ধে অতীতেও কিছু ভ্রান্ত ফিরকা অবস্থান নিয়েছে। সুতরাং বর্তমান বিরুদ্ধবাদীরাও তাদেরই উত্তরসূরী বৈ কিছু নয়। লেখক পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিকরুল্লাহর বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতির উপর প্রমাণ্য আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের শেষে উপমহাদেশে প্রচলিত চারটি সুফি তরীকার উপর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক আলোচনা ও জিকির-মুরাক্বাবার পদ্ধতি তুলে ধরেছেন। আমদের বিশ্বাস এই পুস্তকখানা পাঠ করে সকলেই উপকৃত হবেন। মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারে এটাই কামনা করছি, তিনি যেনো আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং রোজ কিয়ামতের কঠিন বিপদের সময় এ কিতাবখানা আমাদের জন্য নাযাতের ওয়াসিলা করেন। আমীন।

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনীর পক্ষে
মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী
(পরিচালক)

পরিচ্ছেদ-১

জিকিরুল্লাহর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

– "যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।" (সূরা রা'দ (১৩) : ২৮)

আল্লাহর নামের জিকির হচ্ছে বান্দার জন্য সর্বোত্তম কাজ। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে শতাধিকবার স্বয়ং রাব্বুল আলামীন তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে জিকিরের চেয়ে উত্তম কিছু হতে পারে না। মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় দুশমন হচ্ছে শয়তান। আর শয়তান মানুষকে বিপথগামী করার জন্য সখ্যতা গড়ে তুলে নাফসে আম্মারার (বা দুনিয়াবী খাহেসের) সঙ্গে। সুতরাং নাফসে আম্মারা (نفس أمارة) যেহেতু শয়তানের বন্ধু তাই এটা মানুষের বড় দুশমনও বটে। এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা কার্যকর ও শক্ত অস্ত্র হচ্ছে জিকরুল্লাহ (ذكر الله)। এই জিকির থেকে গাফিল থাকলে দুনিয়া-আখিরাতে মানুষ তার শান্তি-অশান্তি উভয়টি অনুভবের স্থান 'ক্বালব' (قلب) এর মধ্যে প্রভু থেকে দূরত্ব হেতু বিরাট অশান্তি (শাস্তি) টের পেতে থাকবে। সুতরাং একমাত্র জিকিরই হলো আল্লাহর নৈকট্যলাভের উপায় এবং অন্তরের জন্য প্রশান্তি। উপরোক্ত আয়াতে করীমে এটা স্পষ্ট উল্লেখিত হয়েছে।

জিকির ইসলামের পতাকা, জিকির হৃদয়কে ছাফ করার জন্য রেত, জিকির ঈমানের সূক্ষ্ম বিজ্ঞান। জিকির হচ্ছে বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার মহৌষধ। জিকিরই হলো শান্তি ও সফলতার চাবিকাঠি।

জিকির সময় ও সীমাবদ্ধতার আওতা থেকে মুক্ত। কোন্ সময় পড়া জায়িয আর কোন্ সময় না-জায়িয এসব ব্যাপার জিকিরের ক্ষেত্রে প্রজোয্য নয়। জিকির ছাড়া অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব ইত্যাদি করণীয় ইবাদতের সঙ্গে সীমাবদ্ধতা ও সময় সম্পৃক্ত। যেমন নামায ওয়াক্তমত আদায় করতে হবে। রমজানের রোযা রমজান মাসেই রাখতে হবে এবং পবিত্র হজ্জপালন হজ্জের মৌসুমেই পালন করতে হবে। কোন্ সময় কিভাবে এসব জরুরী ইবাদত সেরে নিতে হবে এ ব্যাপারে শরীয়তে পুরো বিশ্লেষণ তথা মাসআলা-মাসায়িল বিদ্যমান। সবাই জানে কিভাবে কি করতে হবে। কিন্তু জিকির স্বতন্ত্র, যে কোন মানুষ যে কোন দিনের যে কোন অংশে আল্লাহর জিকির করতে পারে। জিকিরের গুরুত্ব বর্ণনা করতে যেয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ “বেহেশতবাসী এক জিনিস সম্পর্কে আক্ষেপ করবেঃ পৃথিবীতে থাকতে তারা কেন বেশী বেশী আল্লাহর জিকির করে নি” [আল-হাদীস]। সুতরাং যারা এই জিকির সম্পর্কে নানা কথা বলে মানুষকে এ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে এরা কি আল্লাহকে ভয় করে না? কাল কিয়ামতে এরা কি জবাব দেবে?

- আল্লাহ তাআ'লা তাঁর পবিত্র কালামে ইরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

-“হে বিশ্বাসীগণ! বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করো” [৩৩ ঃ ৪১]। অন্যত্র নিজের বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

-“তারা তাদের প্রতিপালককে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে” [৩ ঃ ১৯১ অংশ]। এই আয়াতে করীম থেকে স্পষ্ট, আল্লাহ চান তাঁর বান্দারা তাঁকে সর্বদাই স্মরণ (জিকির) করুক। এখানে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। দিন-রাত সর্বদাই আল্লাহর জিকিরে থাকা

যাবে। মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে আছে হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, - তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِه

-"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লাহর জিকির করতেন" (সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ৫৫৮)। মুসলিম শরীফের আরেকটি হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তোমার হৃদয় যদি সর্বদা জিকিরের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে তাহলে ফিরিশতারা তোমাকে স্বাগত জানাবে এমনকি যদিও তুমি রাস্তার মাঝখানেই থাকো না কেন।" ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর রচিত মুসলিম শরীফের শরাহতে বলেন, এরূপ দৃশ্য ঐসব লোকদেরকে দেখানো হয় যারা মুরাক্বাবা (مراقبة -ধ্যান), ফিকির (فكر -চিন্তা) ও পরকাল নিয়ে ভাবে।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জান্নাতবাসী কোন ব্যাপারেই আক্ষেপ করবে না একমাত্র একটি ছাড়া আর তাহলো, ঐ সময়টুকু যা কেটেছে আল্লাহ থেকে গাফিল অবস্থায়" [বাইহাকী-শুআব আল ঈমান, তাবারানী]। ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জামি আস-সাগির গ্রন্থে লিখেন, এই হাদীস হাসান।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রার্থনার ক্ষেত্রে তাঁর জিকিরকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন এই বলে:

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

-"আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন; নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে; আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর" [২৯ : ৪৫]। তিনি আরও ইরশাদ করেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

–"নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয়; এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে।" [৮৭ ঃ ১৪-১৫]। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

-"আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।" [২০ : ১৪]।

ইবনে হাজর আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ আল্লাহর স্মরণ ছাড়া মানুষ কোন ধরনের ভালো কাজ করতে পারে না। সুতরাং কোন ভালো কাজ যেমন সাদক্বা দেওয়া কিংবা রমযানের রোযা পালনের সময় যদি কেউ আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল থাকে তাহলে সেই ভালো কাজ বা প্রার্থনা না-মঞ্জুর হবে। তাহলে বুঝা গেল ভালো কাজ সম্পাদনেও জিকির একান্ত জরুরী। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "পৃথিবী ও এর মধ্যস্থিত সবকিছু অভিশপ্ত, শুধুমাত্র জিকির এবং যা জিকিরের সঙ্গে জড়িত তা ছাড়া। জিকিরের শিক্ষক ও শিষ্যও অভিশাপ থেকে মুক্ত" [তিরমিযী]। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এছাড়া ইবনে মাজাহ এবং বাইহাকীও একই মন্তব্য

করেন। আল্লামা সূয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'আল জামি আস-ছাগীর' গ্রন্থে এই হাদীসটি ইবনে মাসুদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি এটাকে সহীহ বলে ঘোষণা দেন। এছাড়া তাবারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল-আওসাত গ্রন্থে আবু আদ-দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে এই একই হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।

উক্ত হাদীস শরীফে পৃথিবী ও এর মধ্যস্থিত সবকিছু বলতে আল্লাহ ছাড়া সবকিছুকে বুঝাচ্ছে অর্থাৎ গ্বাইরুল্লাহ। এখানে অভিশপ্ত বলতে জড় জগতকে বুঝাচ্ছে, কিন্তু যেহেতু জড় জগতও আল্লাহর জিকিরে সদালিপ্ত তাই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না। কারণ স্বয়ং রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কালামে বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহর তাসবীহ পড়ে এবং তাসবীহ হচ্ছে এক প্রকারের জিকির।

জাকিরীন আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম সম্মানী হিসেবে স্বীকৃত। কুরআন শরীফে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ; رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

-"আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা- বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।" [২৪ ঃ ৩৬-৩৭]।

শবে মিরাজের রাতে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্ত আসমান পেরিয়ে উর্ধ্বজগতে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তিনি হঠাৎ

লিখনীর শব্দ শোনতে পেলেন। অর্থাৎ তিনি কলম দ্বারা লিখার ধ্বনি শোনলেন। তিনি আরও দেখলেন এক লোক আরশে আজীমের নূরের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথী জিব্রাঈল (আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রশ্ন করলেন: এ লোকটি কে? তিনি কি একজন ফিরিশতা? জিব্রাঈল (আঃ) জবাব দিলেন: না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন: তাহলে তিনি কি একজন নবী? পুনরায় জবাব আসলো: না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার এ লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে জিব্রাঈল (আঃ) বললেন: তিনি সেই লোক, পৃথিবীতে থাকাকালীন যার রসনা আল্লাহর জিকিরে সিক্ত থাকতো, যার হৃদয় ছিলো মাসজিদের প্রতি আকৃষ্ট এবং যে তার মাতা-পিতার অভিশাপ থেকে সর্বদা মুক্ত ছিলো। এই রিওয়ায়েতটি শেখ মুহাম্মদ আলাওয়ী আল-মালিকী তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আল-আনওয়ার আল-বাহিয়্যা মিন ইসরা ওয়া মিরাজ খাইর আল-বারিয়্যা'-তে বর্ণনা করেন।

আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং ইবনে হিব্বানে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এটিকে তাঁরা হাসান বলেছেন। হাদীসটি হলো:

جَاءَ أَعْرَابِيَّانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَقَالَ الْآخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ أَتَثَبَّتُ بِهِ فَقَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"একদা একব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাজির হয়ে বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইসলামের আইন-কানুন আমার কাছে বেশী কঠিন হয়ে গেছে। আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা আমি সর্বদা আমল করতে পারি। [এখানে উল্লেখ্য যে, লোকটি ইসলামের মৌলিক

বিষয়াদির ব্যাপারে অভিযোগ করছিলো না বরং নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে সে একটি সহজ পন্থা খোঁজছিল যা থেকে অল্প পরিশ্রমে সে বেশী সওয়াব হাসিল করতে সক্ষম হয়।] আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "[আমি তোমাকে একটি ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি যে] তোমার জিহ্বা সর্বদা আল্লাহর জিকির দ্বারা সিক্ত রেখো"।

এটা সবার জানা কথা যে, জিহাদ হচ্ছে একটি উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। তবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিকিরকে এই জিহাদ থেকেও উন্নতমানের বলেছেন। আবু আদ দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সাহাবী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে বললেন: "আমি কি তোমাদেরকে সর্বাপেক্ষা উত্তম একটি আমলের কথা বলবো যা মহান প্রতিপালকের নিকট সর্বোচ্চ ইবাদত, যার ফলে তোমরা কিয়ামতের দিন মর্যাদার অধিকারী হবে এবং যার প্রতিদান স্বর্ণ-রৌপ্য আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কিংবা জিহাদে অংশগ্রহণ থেকেও উত্তম? মনে রেখো এটা হলো জিকরুল্লাহ" [মুয়াত্তায়ে মালিক, মুসনাদে আহমাদ, সুনানে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং মুসতাদারাকে হাকীম। ইমাম বায়হাকী ও অন্যান্যরা এ হাদীসটিকে সহীহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।]

আবু সাঈদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে আছে: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হলো, রোজ কিয়ামতে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী কে হবে? তিনি জবাব দিলেন, "যে আল্লাহকে বেশী স্মরণ করে।" [বর্ণনাকারী বলেন] আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর পথে জিহাদীদের ব্যাপারে কি হবে? তিনি বললেন, "এমনকি কেউ যদি তার অসি দিয়ে মুশরিক ও কাফিরদের আঘাত হানতে হানতে তা ভেঙ্গে ফেলে এবং সে রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় তথাপি জাকিরীন তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান পাবে" [আহমাদ, তিরমিযী ও বাইহাকী]।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেক জিনিসের পলিশ (রেত) আছে এবং হৃদয়ের পলিশ হচ্ছে জিকরুল্লাহ। আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার

উপায় জিকরুল্লাহ থেকে উত্তম কিছু নাই"। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, আল্লাহর পথে জিহাদের প্রতিদানও কি অনুরূপ নয়? তিনি জবাব দিলেন: "কেউ যদি (জিহাদ করতে করতে) তার তলোয়ার ভেঙ্গে ফেলে তবুও নয়" [কিতাব আদ-দাওয়াত আল-কবীর ও শুয়াব আল ঈমান, ইমাম বায়হাকী; মিশকাত আল-মাসাবিহ, তিরমিযী।]

উপরোদ্ধৃত কুরআন ও হাদীস শরীফের ভাষ্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে, আল্লাহর জিকির থেকেও উত্তম কোন ইবাদত নেই। এ ব্যাপারে কারো মনে কোন সন্দেহ থাকার কোনরূপ কারণ থাকতে পারে না। অথচ আল্লাহর জিকিরের চেয়ে সহজ ইবাদতও আর কোনটি নেই। মানুষের পক্ষে তার মন, অনুভূতি ও চেতনায় আল্লাহর স্মরণকে জাগ্রত রাখা একেবারেই সহজ-সরল কাজ। এর মাধ্যমে মানুষ প্রভুর দিকে দিন দিন ধাবিত হতে থাকে। হাক্বিকতের নূরে তার হৃদয় আলোকিত হয়ে উঠে। পাপ-কার্যের প্রতি জন্মে ঘৃণা এবং সৎকাজের প্রতি সৃষ্টি হয় আকর্ষণ। আল্লাহর জিকির এমন এক উচ্চ পর্যায়ের আমল যে, এর প্রতিদান ও সুফল এই পৃথিবীতে জীবিত থাকাবস্থায় মানুষ অনুভব করে থাকে। আর সর্বোচ্চ পর্যায়ে এই জিকির পৌঁছে গেলে তার তাকদির খুলে যেতে পারে। ইশকে ইলাহীর ছোঁয়া পেয়ে সত্যিকার অর্থে সে আল্লাহর খাস বান্দাহর সৌভাগ্য অর্জনে সক্ষম হয়। সুতরাং সর্বোত্তম এই ইবাদত তথা জিকরুল্লাহ সম্পর্কে যারা নেতিবাচক অতিকথা কিংবা বাড়াবাড়ি করছে তারা সত্যিই ভ্রান্ত। কারণ, আল্লাহর সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় ইবাদত করার ক্ষেত্রে এরা মানুষকে বিভ্রান্ত করে তুলছে। শরীয়তের গণ্ডিসীমার ভেতরে থেকে যার যেরূপ ইচ্ছা আল্লাহকে স্মরণ করুক, এতে লাভ ছাড়া ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই। কারণ জাকিরীনকে আল্লাহ পাক ভালোবাসেন এবং যাকে তিনি মাহাব্বাত করেন তার হিফাজত তিনি অবশ্যই করবেন।

পরিচ্ছেদ-২

জিকিরের অর্থ

জিকির (ذكر) শব্দের অনেক অর্থ আছে। যেমনঃ ১. আল্লাহর কিতাব ও তা তিলাওয়াত, ২. প্রার্থনা (নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, সাদকা ইত্যাদি), ৩. শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান, ৪. জিহ্বা দিয়ে আল্লাহকে ডাকা, ৫. হৃদয় দিয়ে (ক্বালবের মাধ্যমে) আল্লাহর স্মরণ ইত্যাদি সবই জিকরুল্লাহ হিসেবে স্বীকৃত।

'ফিক্হ আস-সুন্নাহ' এর লেখক সাঈদ ইবনে জুবায়ের বলেনঃ যে কেহ আল্লাহর নির্দেশ পালন করে সে মূলত আল্লাহকেই স্মরণ করছে। ইবনে আতা বলেনঃ যেখানেই শরীয়ত মুতাবিক কাজ সম্পাদিত হয় সেখানেই আল্লাহর জিকির হচ্ছে বলে ধরে নিতে হবে। যেমনঃ শরীয়তের আইনসঙ্গত উপায়ে ক্রয়-বিক্রয়, নামায, রোযা, বিবাহ, তালাক এবং হজ্জ পালন। কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ জ্ঞানার্জন ও ফিকির হচ্ছে জিকির। আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা, শরীয়ত, সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে গবেষণা, অতীতের সুপথপ্রাপ্ত আমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে কথাবার্তা, তাদের শিক্ষাকে অনুসরণ করা ইত্যাদিও জিকির। তবে খাস করে জিকির হচ্ছে মুখ অথবা ক্বালব দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করা। আর এ পুস্তকের মূল বক্তব্যও এরূপ জিকিরকে নিয়ে।

আল্লাহর কালামে ইরশাদ হয়েছেঃ "ঈমানদার তারা যাদের সামনে আল্লাহর নাম বলা হলে তাদের হৃদয়ে কম্পন শুরু হয়ে যায়" [সূরা আনফাল]। হাদীস শরীফে আছেঃ জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

-"আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুণেছি, সর্বোত্তম জিকির হচ্ছে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, এবং সর্বোত্তম দু'আ হলো, আলহামদুলিল্লাহ" [সুনানে ইবনে মাযাহ]।

আল্লাহর জিকির যখন হৃদয় দিয়ে করা হয় তখন এটা হয়ে উঠে সত্যিকার অর্থে উচ্চ পর্যয়ের জিকির যার প্রতিদান ও সুফল বর্ণনাতীত। পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

-"আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও জিকিরকারী নারী- তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার" [৩৩ : ৩৫ (অংশ)]। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পবিত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ "যাদের হৃদয় একক তারাই অগ্রগামী। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কারা একক হৃদয়ের অধিকারী? তিনি তখন উপরোক্ত আয়াতে করীম তিলাওয়াত করলেন" [মুসলিম শরীফ]। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত মুসলিম শরীফের অপর একটি হাদীসে আছেঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু-কে উপদেশ দিলেন, "আমার পায়ের জুতো পরে যাও! এবং এসব দেওয়ালের অপরপ্রান্তে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহর উপর হৃদয় দিয়ে সাক্ষীদাতা যাকেই তুমি পাবে তাকে বলো, খুশ খবর! তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে"।

জিকিরের মানে কোন কোন সময় এটাও হয় যে, ক্বালব এবং জিহ্বা দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করা। যেমন পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

-"সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না" [২:১৫২]। এই পবিত্র আয়াতের অর্থ যখন একটি হাদীসে কুদসির আলোকে পাঠ করা হয় তখনই এর গভীর মর্ম স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই হাদীসে কুদসী হলোঃ

"যারা আমাকে তাদের হৃদয়ে স্মরণ করে, আমি তাদেরকে আমার হৃদয়ে স্মরণ করি; এবং যারা আমাকে একত্রে জড়িত হয়ে (অর্থাৎ একাধিক লোক বসে সশব্দে) স্মরণ করে, আমিও তাদেরকে স্মরণ করি (অর্থাৎ তাদের কথা বলি) এমন একটি সবাবেশে যা তাদেরটি থেকেও উত্তম"।

সুতরাং আল্লাহর জিকির মূলত তিন ধরণের। ১. ক্বালবের জিকির, ২. জিহ্বার জিকির এবং ৩. এ দু'য়ের সমন্বয়ে একত্রে জিকির। এবার আমরা পুর্বোল্লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস শরীফের আলোকে জিকরুল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করবো।

পুর্বোল্লিখিত এই হাদীসটি এখানে আবার তুলে ধরা জরুরি। এই হাদীসটি হলোঃ আবু আদ-দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সাহাবীদেরকে (রাদ্বিআল্লাহু আনহুম) প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে বললেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে সর্বাপেক্ষা উত্তম একটি আমলের কথা বলবো যা মহান প্রতিপালকের নিকট সর্বোচ্চ ইবাদত, যার ফলে তোমরা কিয়ামতের দিন মর্যাদার অধিকারী হবে এবং যার প্রতিদান স্বর্ণ-রৌপ্য আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কিংবা জিহাদে অংশগ্রহণ থেকেও উত্তম? মনে রোখো এটা হলো জিকরুল্লাহ" [মুয়াত্তায়ে মালিক, মুসনাদে আহমাদ, সুনানে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং মুসতাদারাকে হাকীম]।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজর আল-আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রখ্যাত শরাহ ফাতহুল বারী গ্রন্থে লিখেনঃ আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে হাদীসে জিকরুল্লাহকে জিহাদের চেয়েও উত্তম বলা হয়েছে, সেই জিকির হচ্ছে, পূর্ণ চেতনা ও অনুভূতির মাধ্যমে আল্লাহর মাহাত্ম্য ও পবিত্রতাকে স্মরণ রাখা। কেউ যদি এরূপ চেতনাশীল না হয়ে জিহাদের ময়দানে কাফিরদের কতল করে তাহলে সেটা থেকেও এর মর্যাদা বেশী। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, পূর্ণ চেতনাসহ আল্লাহর জিকির মানুষের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। অবশ্য কেউ যদি এরূপ জিকিরের মাধ্যমে জিহাদ করে তবে তার জন্য তা আরও বেশী উত্তম।

বাস্তবে আল্লাহকে এভাবে স্মরণ করা অনেকের ভাগ্যে জুটেনা। আমরা অচিরেই দুনিয়ার ভেজালে পড়ে চেতনা থেকে আল্লাহর স্মরণকে বিসর্জন দিয়ে বসি। আল্লাহকে ক্বালব দ্বারা সচেতনভাবে সর্বদা স্মরণ রাখা অতি সহজ কাজ নয়। কারণ, দুনিয়া, নফসে আম্মারা এবং সর্বোপরি শয়তান তো সর্বদাই আমাদের দুশমনী করে যাচ্ছে। এই দুশমনদের কবল থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত চেতনাশীল হয়ে ক্বালবের ভেতর আল্লাহর স্মরণকে স্থায়ী করা আদৌ সম্ভব নয়। আর এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হলে দরকার হয় উপযুক্ত গুরুর। যে এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন তিনি জানবেন, কিভাবে দুশমনদের মুবাকবিলা করলে আমরা বিজয়ী হতে পারবো। আত্মিক পরিশুদ্ধি ও দুশমনদের পরাজিত করার জন্য তাই অভিজ্ঞ ও খাঁটি মুর্শিদে কামিল একান্ত প্রয়োজন। চলার পথে যেসব মহাবিপদ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হবে তখন অভিজ্ঞ কোন পথনির্দেশক ছাড়া অতি সহজেই পথবিচ্যুত হয়ে আহত পাখির মতো দিশেহারা হবো। মুর্শিদে কামিল ছাড়া আল্লাহর জিকিরকে ক্বালবে স্থায়ী করে প্রভুর সান্নিধ্য লাভের মতো উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হওয়া তাই প্রায় অসম্ভব। যারা মনে করে এরূপ পথনির্দেশক ছাড়াই নৈকট্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ সম্ভব তারা মূলত আসল নৈকট্য কি তা জানে না। তবে হ্যাঁ, যে যতটুকু ইবাদত বন্দেগী করবে তার সুফল অবশ্যই ভোগ করবে। কিন্তু ইলমে মা'রিফাতের মাধ্যমে ইশকে ইলাহীর ছোঁয়া ও নৈকট্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছা তাদের জন্য সুদূরপরাহত।

জিকিরারুহর মাধ্যমেই মানুষ সত্যিকার অর্থে জিন্দা হয়। জিকিরের মর্যাদা বর্ণনা করতে যেয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিকিরকারী ও লা-জিকিরকারীদের কথা তুলে ধরেছেন এভাবে:

مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى والميت

অর্থাৎ “প্রভুর জিকিরকারী ও লা-জিকিরকারীদের তুলনা হচ্ছে জীবিত ও মৃত্য ব্যক্তিদের মতো” [সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]।

ইবনে হাজর আল-আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফাতহুল বারীতে এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে জিকির বলেত যা

বুঝাচ্ছে তা হলো বেশী বেশী করে মুখে ও অন্তরে আল্লাহর পবিত্র নামের জিকির করা। যেমনঃ সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার বলা। এছাড়া, লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, ইস্তিগ্বফার ইত্যাদি বলাও বুঝাচ্ছে।

জিকরুল্লাহ বলতে কুরআন তিলাওয়াত, হাদীস অধ্যয়ন এবং ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনকেও বুঝানো হয়। জিকির জিহ্বার দ্বারা হতে পারে এবং এর অর্থ বুঝা জরুরী নয়, যদিও বুঝে পড়া আরও ভালো। একই সাথে কেউ যদি হৃদয় (قلب) দিয়েও জিকির পড়ে তাহলে তা হলো পূর্ণ জিকির। তবে এরচেয়ে আরও উন্নতমানে জিকির হচ্ছে, মুখ এবং হৃদয় দিয়ে পাঠের সাথে সাথে যা বলা হচ্ছে তার অর্থ ও গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করা। শেষোক্ত পদ্ধতিতেই আল্লাহর ওলি-আবদাল-আ'রিফরা জিকির করে থাকেন। তাঁরা জিকিরের সাথে সাথে এর গভীর মা'রিফাত সম্পর্কে অবগত। সুতরাং তাদের উপর জিকিরের তাছির বা প্রভাব পড়ে সর্বাপেক্ষা বেশী। জিকির পড়ার সময় হৃদয়ে হাক্বিকতের নূর প্রতিফলিত হয়। হৃদয়টা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে আল্লাহর ইশ্‌কে। তাঁরাই জিকিরের মাধ্যমে অনুভব করেন, চিত্তের প্রশান্তি। এরূপ উচ্চ পর্যায়ের জিকিরের জন্য প্রয়োজন, আয়নার মতো স্বচ্ছ একটি হৃদয়ের। হৃদয় যতো বেশী সাফ হবে, গায়রুল্লাহর কবল থেকে যতো বেশী মুক্ত থাকবে তাতে হাক্বিকতের তাজাল্লি ততো বেশী জ্যোতির্ময় হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। আর এরূপ উচ্চ পর্যায়ের জিকিরই হচ্ছে আল্লাহর দরবারে সর্বোত্তম জিকির। এরূপ জিকিরকারীরাই মা'বুদের খাস বান্দা ও বন্ধুজন।

হযরত ফখরুদ্দিন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ জিহ্বার জিকিরের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর শানে তাসবীহ, তাহমিদ, প্রশংসা এবং মাহাত্ম্য জপ করা। ক্বালবের জিকিরের অর্থ হলো যে হৃদয়ে আল্লাহর গুণাবলীর প্রতিচ্ছবি বা নূর ফুটে ওঠে। এ থেকে বান্দার মনে আল্লাহর আনুগত্য, হারাম থেকে বাঁচা ও হালালের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। ক্বালবের জিকিরের মাধ্যমে জাকিরীনের অন্তরে আল্লাহর সৃষ্টজগতের রাহস্যাবলী উদঘাটিত হতে থাকে। হাত-পায়ের জিকির হচ্ছে, আল্লাহর

আনুগত্যের মধ্যে থেকে খাওয়া ও চলাফেরা এবং নামায রোযা ইত্যাদি ইবাদত করা। এই কারণেই জিকিরকে আল্লাহ্‌ পাক উপাসনা বলেছেন। তিনি বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

-"হে মু'মিনগণ, জুমু'আর দিনে যখন নামাযের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর জিকিরের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর, এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ" [৬২:৯]।

আল্লাহর নৈকট্যশীল বন্ধুজনরা বলেছেন, প্রকৃত জিকিরের অবস্থা হলো ৭টি। **১. বুকা** (بكى)- চোখের জিকির যা ক্রন্দনের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। **২. ইসগ্বাহ**- এটা হলো কানের জিকির। এই জিকিরের সঙ্গে শ্রবণের সম্পর্ক। **৩. সানা**- জিহ্বার জিকির। এই জিকির হচ্ছে জিহ্বার দ্বারা আল্লাহর গুণগান। **৪. আতা**- হাতের জিকির। এটা হলো হাত দ্বারা অনুদান। **৫. ওয়াফা**- শরীরের জিকির- এই জিকির হচ্ছে আনুগত্য। **৬. খওফ ওয়া রেযা**- ক্বালবের জিকির। এর মূলে আছে আল্লাহর ভয় ও তাঁর প্রতি ভরসা। **৭ তাছলিম ওয়া রিদা**- এটা হলো আত্মার বা রূহের জিকির। এর মূলে আছে প্রভুর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পন ও প্রভুর যে কোন ফায়সালাকে বিনাবাক্যে মেনে নেওয়া।

পরিচ্ছেদ-৩

সশব্দে এবং একাধিক ব্যক্তির একসঙ্গে জিকির

আল্লাহর জিকির পড়ার কোন বিশেষ ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। তবে এমনভাবে পড়া উচিত নয় যাতে অন্যের ক্ষতি কিংবা উদ্ভট বলে প্রতীয়মান হয়। সশব্দে জিকির পড়া কেউ কেউ সঠিক নয় বলেছেন। কিন্তু আসলে সশব্দে পড়ার পক্ষে একাধিক দলীল আছে।

আমাদের পিয়ারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একব্যক্তির গুণগান করেছেন, যে ছিলো আওওয়াহ- অর্থাৎ যে বলতো আহ! জিকির করার সময় তার মুখ দিয়ে আহ! শব্দটি সজোরে বেরিয়ে আসতো। ঘটনাটি একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হযরত উবাদা ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ জু আল-বিযাদাইন নামক এক ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "ইন্নাহু আওওয়াহ- অর্থাৎ এ লোকটি খুব বেশী আহ! বলে। এর কারণ হচ্ছে এ লোকটি জিকরুল্লাহ বেশী বেশী করে থাকে এবং কুরআন পাঠ করে এবং যখন সে কাকুতি-মিনতি করে তখন জোরেসুরে করে" [মুসনাদে আহমাদ]।

পবিত্র কুরআন শরীফে রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেনঃ

[ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্যে] إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

-"অবশ্যই, ইব্রাহিম হলেন **'আওওয়াহ এবং হালিম'**" [৯ঃ১১৪]। তাফসিরে জালালাইনে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এর অর্থ হলো, প্রভুর শাস্তির ভয়ে চিৎকার করা। ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ رَبِّ اجْعَلْنِي إِلَيْكَ أَوَّاهًا -"রাব্বিয আলনী ইলাইকা আওওয়াহান"- হে আল্লাহ! যে সর্বদা আপনার প্রতি আহ! বলে চিৎকার করে তার মতো আমাকে করো [তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ]।

ইতোমধ্যে আমরা একটি হাদীসে কুদসীর কথা এখানে উল্লেখ করেছি। এই হাদীসে 'যারা আমাকে (অর্থাৎ আল্লাহকে) মজলিসে বসে স্মরণ করে' কথাটি বলা হয়েছে। সুতরাং একত্রে বসে জিকির করার ফায়দা কি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাস্তবে মজলিসে বসে জোরেসুরে আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমেই 'ফায কুরুনী আজকুরকুম'- আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো- আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতির সুফল অর্জন হয়ে থাকে। এছাড়া আরও অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, একাধিক ব্যক্তি একত্রে বসে আল্লাহর জিকির করার মধ্যে বিরাট নিয়ামত নিহীত। এখানে এর দু'একটি মাত্র তুলে ধরা হলো।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের একটি দীর্ঘ হাদীসে আছেঃ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একদল ফিরিশতা আছেন যারা সর্বত্র ঘোরাফেরা করেন এই উদ্দেশ্যে যে, কোথাও কোন লোক জিকিরে লিপ্ত আছে কি না তা দেখার জন্য। ঐসব লোককে তারা খুঁজছেন যারা বলে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ এবং অনুরূপ বাক্য। যখন তারা এরূপ জিকিরে লিপ্ত কোন কওমকে দেখেন তখন ফিরিশতারা একে অন্যকে ডাকাডাকি করেন এবং প্রথম আসমানের শেষ পর্যন্ত সারিবদ্ধভাবে অবস্থান নেন। তারা ঐসব জাকিরীনদের ঘেরাও করে ফেলেন। [এখানে উল্লেখ্য যে, হাদীসে একথা বলা হয়নি তারা যখন এক ব্যক্তিকে জিকিররত অবায় দেখতে পান- বরং বলা হয়েছে কওম অর্থাৎ একটি দেশ বা গোষ্ঠি] আল্লাহ তখন তাঁর ফিরিশতাদের জিজ্ঞেস করেন, যদিও তিনি সবকিছু অবগত- আমার বান্দারা কি করছে? ফিরিশতারা জবাবে বলেন, তারা আপনার প্রশংসা করছে (تسبيح - তাসবীহ), আপনার তাক্ববীর উচ্চারণ করে আপনার বড়ত্বের ঘোষণা দিচ্ছে (تكبير - তাকবীর), তাঁরা আপনার মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে (تحميد - তাহমিদ) এবং আপনার গুণগান করছে (تمجيد - তামজিদ)। আল্লাহ বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? ফিরিশতারা জবাব দেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তারা আপনাকে দেখে নি। তিনি বলেন, তারা যদি আমাকে দেখতো তাহলে কি করতো? ফিরিশতারা বলেন, হে প্রতিপালক! তারা যদি আপনাকে দেখতো তাহলে

নিশ্চয়ই আরো বেশী ইবাদত করতো, বেশী বেশী তাসবীহ, তাকবির এবং তামজিদ করায় মশগুল হতো। আল্লাহ বলেন, তারা আমার কাছে কি চায়? ফিরিশতারা জবাব দেন, তারা আপনার বেহেশত কামনা করে। তিনি বলেন, তারা কি বেহেশত দেখেছে? নূরের ফিরিশতারা জবাব দেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তারাতো বেহেশত দেখেনি। রাব্বুল আলামীন বলেন, তারা তা দেখলে কি মনে করবে? ফিরিশতারা বলেন, যদি তারা বেহেশত দেখতে পারতো তাহলে অবশ্যই তারা এটা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বেশী করে নিজেদেরকে জড়িয়ে দিতো। ইরশাদ হলোঃ তারা কি জিনিস থেকে ভয় পাচ্ছে এবং দূরে ছুটে যাচ্ছে? তারা বলেন, এই লোকগুলো দোযখের আগুনকে ভয় করছে এবং এ থেকে দৌড়ে পালাচ্ছে। আল্লাহ বলেন, এবং তারা কি দোযখের আগুন দেখেছে? তারা জবাব দেন, হে আমাদের প্রতিপালক! না, তারা দোযখের আগুন দেখে নি। তিনি বলেন, তারা যদি তা দেখতো তাহলে তারা কি করতো? তারা বলেন, তাহলে তারা এ থেকেও আরো বেশী দূরে পালাবার চেষ্টা করতো। এর ভয়ে তারা আরও বেশী আতঙ্কিত হতো। এবার আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি (অর্থাৎ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি- কারণ বাস্তবে সাক্ষী হিসাবে তো স্বয়ং আল্লাহই যথেষ্ট) যে, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। একজন ফিরিশতা তখন বলেন, হে আমার প্রতিপালক! এখানে একব্যক্তি ছিলো যে উক্ত দলের সঙ্গী নয়। সে অন্য এক কাজে এখানে উপস্থিত হয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ এই দলের লোকগুলো এমন যে, যে কেহ এদের সঙ্গে বসবে- সে যে কারণেই হোক না কেন, এই ব্যক্তির পাপও মাফ হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ! একত্রে জিকির পড়ার মর্যাদা এতো মহান।

উক্ত হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল্লামা আহমাদ মশহুর আল-হাদ্দাদ তাঁর মিফতাহুল জান্নাহ নামক কিতাবে লিখেনঃ একত্রে একাধিক ব্যক্তি বসে জিকির পড়ার মধ্যে কত বড় মর্তবা নিহীত তা এই হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়েছে। আর এই জিকির পড়তে হবে সশব্দে। কারণ হাদীসে এই কথাগুলো এসেছেঃ তারা আপনাকে স্মরণ করছে- এটা বহুবচনে বলা হয়েছে এবং তারা ঐসব লোক যারা বসে আছে। এর অর্থ

হলো যারা একত্রে বসে আল্লাহর জিকিরের উদ্দেশ্যে এবং তা একই সঙ্গে উচ্চারণ করে। আর এভাবে জিকির করা সশব্দে ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নয়। কারণ, নিঃশব্দে জিকির করার জন্য অন্য কারো সঙ্গে বসার কোন মানে নাই এবং প্রয়োজনও নাই।

এ ব্যাপারে একটি হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে; আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যা আশা করে আমি তা-ই, আমি তার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। সে যদি আমাকে তার হৃদয়ের মধ্যে স্মরণ করে, আমি তাকে সরাসরি স্মরণ করি। যে যদি কোন (জিকিরের) মাহফিলে আমাকে স্মরণ করে তবে আমি তাকে স্মরণ করি এমন একটি মাহফিলে যা তার মাহফিল থেকে উত্তম [বুখারী, মুসলিম]।

সুতরাং একত্রে একাধিক ব্যক্তি বসে জিকির করার আলাদা ফায়দা আছে। আর এই জিকির তো অবশ্যই সশব্দে পড়তে হবে। অন্যথায় একত্রে বসে পড়ার কোন মানে নেই। এছাড়া জিকির করার সময় সবাইকে একই সঙ্গে করতে হবে। তাই একত্রে বসে জিকির পড়ার ব্যাপারে কোন ধরণের সমস্যা নেই বরং তা অত্যন্ত ফলদায়ক ইবাদাত।

পবিত্র মিরাজ রজনীর বিভিন্ন বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায় ফিরিশতারাও একত্রে বসে ও দাঁড়িয়ে আল্লাহর জিকির পড়েন। এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানে ফিরিশতাদের জিকির স্বচক্ষে অবলোকন ও শ্রবণ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায়, পবিত্র নূরের ফিরিশতারা যদি একত্রে জিকির পড়ে থাকেন তাহলে মানুষের জন্য তা করা নিয়ামতের হবে এটা স্বাভাবিক। তবে যে কোন ইবাদতের মতো এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। যেমন, জিকিরের সময় নাচানাচি, লাফালাফি, অত্যধিক জোরে সুরে জিকির পড়া কিংবা নিজের শরীরে হাত দ্বারা আঘাত হানা। এসব করা মোটেই শরীয়তসম্মত নয়।

জিকির সশব্দে কিংবা নিঃশব্দে পড়ার মধ্যে নিয়ামত বিরাট। নিঃশব্দে ক্বালবের মাধ্যমে জিকরুল্লাহর সুফল ও প্রতিদান সম্পর্কে ইতোমধ্যে আমরা অবগত হয়েছি। আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মাদুর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "একক-হৃদয়ের মানুষ সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। সাহাবীরা (রিদ্বওয়ানাল্লাহি তা'আলা আনহুম) প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একক-হৃদয়বান কারা? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, ঐসব পুরুষ ও মহিলা যারা অবিরত আল্লাহর জিকির করে" [মুসলিম]।

এই হাদীস শরীফে এটাই বুঝানো হচ্ছে যে, ঐসব ভাগ্যবান নারী-পুরুষ প্রতিটি ক্ষণে আল্লাহর জিকির করেন। আর প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহর জিকির করার একমাত্র উপায় হচ্ছে হৃদয়কে শুধুমাত্র আল্লাহর স্মরণে ডুবিয়ে রাখা। অর্থাৎ ক্বালবের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না, পুরো গায়রুল্লাহর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে। এরূপ জিকির হচ্ছে উচ্চ পর্যায়ের স্মরণ এবং এই অবস্থা অর্জনে কঠোর সাধনার দরকার পড়ে। দুনিয়ার লালসা, লোভ, রিয়া, কাম-ক্রোধ, পাপকার্য ইত্যাদি মানুষের হৃদয়ে মরিচা সৃষ্টি করে একে আল্লাহ থেকে গাফিল করে দেয়। এই মরিচাকে দূর করার জন্য জিকরুল্লাহর মতো মহৌষধ আর কিছুই নাই। আল্লাহর ওলি-আবদাল ও বন্ধুজনের সুহবতে থেকে আল্লাহর জিকিরকে হৃদয়ে স্থায়ী করার জন্য সাহায্য নেওয়া জরুরী। অন্যথায় হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী একক হৃদয়ের অধিকারী হওয়া কঠিন হবে।

উপরোক্ত হাদীস শরীফে আল-মুফাররিদুন (المفردون) শব্দটি এসেছে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো, একক হৃদয়বান। আল্লামা ইবনে কাইয়ূম আল-যাওজিয়াহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মাদারিজুস সালিকীন কিতাবে লিখেছেন, আল-মুফাররিদুন শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রথমত, এর অর্থ হবে মুওয়াহিদুন যার অর্থ হলো, তাওহীদের ঘোষণায় নিমগ্ন মানুষ (বহুবচনে) অর্থাৎ যারা একত্রে বসে আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি দেয় (যেমন-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ পড়া)। দ্বিতীয়ত, এর অর্থ হবে আহাদ ফুরাদা অর্থাৎ কোন এক ব্যক্তি একা বসে একই ঘোষণা দেয় (তাওহীদের স্বীকৃতি দান)। সুতরাং এ কথা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, ইবনে কাইয়ূম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে একত্রে একাধিক মানুষ বসে জিকির পড়া যেমন জায়িয ঠিক তেমনি এককভাবে বসে পড়াও জায়িয। ইবনে কাইয়ূম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও বলেছেন, মুফাররিদুন এর অর্থ এটাও গ্রহণযোগ্য- জিকির পড়ার সময় যারা

অস্বাভাবিকভাবে কাঁপতে থাকে, অন্যরা কি বললো বা না, সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করে না। এ কথাটি বলার পেছনে কারণ হলো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

-"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ পাকের জিকির খুব বেশী করে করো" (সূরা আহযাব: ৪১)। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আকছিরূ জিকরাল্লাহি হাত্তা ইয়াকূলু মাজনুন"।

(اكثر ذكر الله حتى يقولوا مجنون)- অর্থাৎ "আল্লাহকে এতো অধিক স্মরণ করো যে, মানুষ যেনো ভাবে তুমি পাগল হয়ে গেছো" [মুসনাদে আহমাদ, ইবনে হিব্বান, হাকীম]। এখানে অন্যরা যাই বলুক না কেন, তুমি পাগলের মতো তোমার প্রভুর জিকিরে মত্ত হও, এই কথাটি পরিষ্কার বলা হয়েছে। এ কারণেই জিকিরের সময় হরকত [দেহের নড়াচড়া] হওয়াতে কোন দোষ নেই। বাস্তবে এই হরকত সৃষ্টি হয় জিকিরের তাছির বা প্রভাবে। জিকির পড়ার সময় এমনিতেই দেহখানা অস্বাভাবিকভাবে ঝুলতে থাকে। অন্যের কাছে তখন এই অবস্থা অনেকটা পাগলের মতোই মনে হয়।

মুফাররিদুন মানুষই সত্যিকার অর্থে জ্যান্ত। একটি হাদীসে আছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যারা জিকির পড়ে এবং যারা পড়েনা তাদের উপমা হলো জ্যান্ত এবং মৃত ব্যক্তি" [বুখারী]। ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যখন জান্নাতের বাগানের নিকট দিয়ে যাবে তখন এ থেকে সুফল গ্রহণ করে নেবে। সাহাবয়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! [এই পৃথিবীতে] জান্নাতের বাগান কোথায়? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, এগুলো হলো জিকিরের চক্র। জিকিরের চক্রের খুঁজে ফিরিশতারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যখন তারা তা পেয়ে যান তখন এটাকে অতি কাছে থেকে ঘিরে রাখেন" [তিরমিযী, আহমাদ]।

আবু সাঈদ খুদরী এবং আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীস শরীফে আছে, পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন, “যখন কোনো একদল লোক আল্লাহকে স্মরণ করে (জিকির পড়ে) তখন ফিরিশতারা তাদের ঘিরে ফেলেন, তাদের উপর পতিত হয় রাহমত ও প্রশান্তি। এবং আল্লাহ এদের সম্পর্কে কথা বলেন [অর্থাৎ এদেরকে স্মরণ করেন]” [মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনে মাযাহ, বাইহাকী]।

মুসলিম, আহমাদ ও তিরিমিযী শরীফের অপর একটি বর্ণনায় জানা যায়, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একদল সাহাবায়ে কিরামের (রিদ্বওয়ানাল্লাহি তা'আলা আজমাঈন) নিকট গিয়ে জিজ্ঞস করলেন:

قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ قَالَ آللهَ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَ اللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ -

“তোমারা এখানে বসে কি করছো?” তাঁরা জবাব দিলেন, আল্লাহকে স্মরণ [আল্লাহর নাম- অর্থাৎ জিকরুল্লাহ] এবং তাঁর প্রশংসা করার জন্য আমরা এখানে বসেছি- কারণ, তিনি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত করছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, “এখানে বসার এটাই কি একমাত্র কারণ?” তাঁরা বললেন, আল্লাহর শপথ, আমরা এখানে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই বসেছি। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আমি তোমাদেরকে আল্লাহর নামে কসম খেতে বলছি না। তবে আমি এই কারণে প্রশ্ন করছি, জিব্রাঈল (আঃ) আমার নিকট এসে বললেন, মহান আল্লাহ পাক ফিরিশতাদের বলছিলেন, তিনি তোমাদের উপর গর্বিত!” সুবাহানাল্লাহ!

উক্ত হাদীস শরীফে (جَلَسْنَا) জালাসনা শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কোন একজন বসে থাকার কথা বলা হয়নি বরং একাধিক লোক বসে থেকে আল্লাহর জিকিরে মগ্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই হাদীস শরীফ থেকে দলে দলে একত্রে বসে জিকরুল্লাহর ফজিলত যে কত বেশী তা সহজেই বুঝা যায়। মহান আল্লাহর দরবারে তা সত্যিই অত্যন্ত পছন্দনীয় কাজ।

সহল ইবনে হাওসাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে একটি বর্ণনায় জানা যায়, একদা হযরত আবু আদ-দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বায়তুল মুকাদ্দাস মাসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন একদল লোক একজন উপদেশদাতার (মুজাক্কিরের) চতুর্দিকে বসে আছেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে জিকির করছিলেন। লোকজন সশব্দে ও ক্রন্দন করতে করতে জিকির পড়ছিলেন। আবু আদ-দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেনঃ আমার মাতা-পিতার জীবন তাদের প্রতি উৎসর্গিত হউক যারা অনুতাপ করে আসল অনুতাপের দিন (কিয়ামত দিবস) উপস্থিত হওয়ার পূর্বে! তারপর তিনি আবার বললেনঃ হে ইবনে হাওসাব! তাড়াতাড়ি এসো, এদের সঙ্গে আমরাও বসে যাই। কারণ, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ "তোমরা যদি বেহেশতের কুঞ্জবন দেখতে পাও তাহলে সেদিকে তাকাবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বেহেশতের কুঞ্জবন কি? তিনি বললেনঃ জাকিরীনের দল। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, এমন কোনো জাকিরীনের দল নেই যাদেরকে চতুর্দিক থেকে ফিরিশতারা এসে ঘেরাও করে রাখেন না এবং রাহমত বর্ষিত হয় না। আল্লাহ জিকিরকারীদের কথা আলোচনা করেন, এবং যখন তারা উঠে চলে যেতে উদ্যত হয় তখন বলা হয়ঃ ওঠো! তোমাদেরকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে। তোমাদের পাপকর্মকে সৎকর্মে পরিণত করা হয়েছে!" একথা বলার পর আবু আদ-দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু মাসজিদের ভেতর জিকিরে রত লোকদের নিকট গিয়ে বসে পড়লেন। [হাফিজ ইবনে জাওযী, আল-ক্বাসাস ওয়াল মুজাক্কিরীন, পৃঃ ৩১]

পরিচ্ছেদ ৪

জিকিরের ধরণ ও পরিমাণ

জিকির হচ্ছে হৃদয়ের জীবন। জিকির ছাড়া হৃদয় প্রাণহীন, নির্জীব। আল্লামা ইবনে কাইয়ূম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন হযরত ইবনে তাইমিয়্যা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র। ইবনে কাইয়ূম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিকিরের গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে তাঁর গুরুর একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইবনে তাইমিয়্যা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "মাছের জন্য পানি যেরূপ জরুরী ঠিক তদ্রূপ হৃদয়ের জন্য জিকির অত্যাবশ্যক"।

প্রখ্যাত ওলিআল্লাহ মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া কান্দালভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ফাজায়েলে জিকির গ্রন্থে জিকিরের কয়েকটি বিশেষ ফায়িদা তুল ধরেছেন। এগুলো হলো:

১. জিকির আল্লাহর প্রতি মহাব্বাত সৃষ্টি করে: যে কেউ মহান আল্লাহর ভালোবাসার আগ্রহী, তাকে বেশী বেশী জিকির করতে হবে। ঠিক যেভাবে লেখাপড়া, গবেষণা, অধ্যয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে জ্ঞানার্জন সম্ভব, সেরূপ জিকিরুল্লাহ হলো আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার উপায়।

২. জিকিরের মাধ্যমে ইহসান বা শ্রেষ্ঠত্ব হাসিল হয়: জিকিরের সঙ্গে মুরাক্বাবা (ধ্যান) জড়িত। ইহসান হাসিল হওয়ার রাস্তা হচ্ছে এই মুরাক্বাবা। জাকিরীন শেষ পর্যন্ত এমন উচ্চ পর্যায়ের জিকির করতে থাকে যে, স্মরণের সময় সে আল্লাহর দীদার লাভে ধন্য হয়।

৩. দলে দলে জিকির করা হচ্ছে দলে দলে ফিরিশতাদের আগমন: একদল লোক আল্লাহর জিকিরে মত্ত হলে তাদের নিকট একদল ফিরিশতা আগমন করেন এবং তাদের উপর বর্ষিত হয় রাহমাত। অপরদিকে জিকিরহীন দল হলো শয়তানের দল। যে মাহফিলে আল্লাহর জিকির নেই সেথায় শয়তান আগমন করে।

৪. যে জিকির করে সে রাহমাতপ্রাপ্ত: জাকিরীনের উপর রাহমাত বর্ষিত হতে থাকে। এমনকি যে তার নিকটে বসে আছে, তার উপরও রাহমাত বর্ষিত হয়। অন্যকথায়, জাকিরীনের সঙ্গীরা জিকির করুক বা না, তারাও রাহমাত থেকে বঞ্চিত হয় না।

৫. জিকির সহজ কিন্তু এর ফায়িদা সর্বোত্তম: জিকির করা অতি সহজ ইবাদাত। হাত-পা নাড়িয়ে অন্যান্য ইবাদাত করতে হয়, কিন্তু জিকিরের জন্য শুধুমাত্র জিহ্বাকে নড়াচড়া কারাই যথেষ্ট। এছাড়া ক্বলবি জিকির করার সময় তো কিছুই নাড়াতে হয় না।

৬. জিকির হচ্ছে এক ধরণের সাদক্বা: আবু যর গিফারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যহ সূর্যোদয়ের সময় প্রত্যেককে সাদক্বা দিতে হয়"। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কাছে টাকা না থাকলে সাদক্বা দেবো কি করে? তিনি বললেন, "সাদক্বার দরজাসমূহ হচ্ছে الله اكبر [আল্লাহ মহান], سبحان الله [আল্লাহ সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন], الحمد لله [যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য], لا إله إلا الله [আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই], استغفر الله [আমি আল্লাহর মাফি কামনা করছি], ভালো কাজ করা, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা। এগুলো সবই সাদক্বার দরজা। এমনকি স্ত্রীসহবাসেরও প্রতিদান আছে" [আহমাদ, ইবনে হিব্বান; মুসলিম শরীফেও অনুরূপ একটি হাদীস আছে]।

আল্লাহর প্রতি সবধরণের প্রশংসা ও মাহাত্ম্যই হলো জিকরুল্লাহর আওতাভূক্ত। যেসব কথা বা বাক্যে আল্লাহর গুণগান, শক্তি-ক্ষমতা, বাদশাহী, সৌন্দর্য এবং মহীমা উচ্চারিত হয় তা সবই স্মরণ বা জিকির। এসব বাক্য বা শব্দ কেউ মুখে উচ্চারণ করতে পারে কিংবা হৃদয় দিয়ে নীরবেও করতে পারে। অনেকে প্রশ্ন করেন, দুনিয়ার বিভিন্ন কাজেকর্মে ব্যস্ত থেকে কিভাবে জিকরুল্লাহর মধ্যে সর্বদা নিমগ্ন থাকা সম্ভব? এ প্রশ্নের জবাবে প্রথমে আমরা আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। তিনি ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

-"হে বিশ্বাসীগণ! বেশী বেশী আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকো; এবং সকালে ও বিকেলে তাঁকে মহিমান্বিত করো [৩৩ : ৪১-৪২]।

তিনি এটাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: "আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো" [২ : ১৫২]। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে স্বয়ং আমাদের প্রতিপালকের ইচ্ছে হলো, তাঁকে সর্বদা স্মরণ করা। এতে তিনি

আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই হলো মানবজীবনের আসল কাম্য বস্তু। সর্বদা আল্লাহর স্মরণে ডুবে থাকতে যেয়ে বসে বসে সর্বক্ষণ জিকির করার প্রয়োজন মোটেই নেই। বাস্তবে আমাদের মন, মস্তিষ্ক ও ক্বালবে আল্লাহর ধ্যান তথা স্মরণকে স্থায়ী করে নিলে পার্থিব কাজকর্মে কোন ধরণের অসুবিধা তো হয়ই না বরং সকল কাজ হয়ে উঠে বরকতময়। এছাড়া এরূপ স্মরণে নিমগ্ন থেকে কেউ পাপকার্জে লিপ্ত হতে পারবে না। পাপের ধারে কাছে গেলেই আল্লাহর স্মরণ তাকে থামিয়ে দেবে। ২৪ ঘণ্টা [ঘুমের মধ্যেও অনেক উচ্চ পর্যায়ের জাকিরীন আছেন যারা জিকির থেকে গাফিল নন] অন্তরে আল্লাহর জিকির স্থায়ী করা সহজ ব্যাপার নয়। তবে এই লক্ষ্যর্জনে আমাদের সবাইবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এই স্তরের জিকির অর্জন করার জন্য কামিল মুর্শিদ বা পথনির্দেশকের প্রয়োজন। মুরীদ বা সালিকের আত্মিক, মানসিক, শারিরীক অবস্থা অবলোকন করে মুর্শিদ সঠিক উপদেশ দান করবেন। মুর্শিদ হচ্ছেন সালিকের আত্মার চিকিৎসক। জিকিরকে স্থায়ী করার জন্য তিনি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন। চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে তাই সর্বদা ক্বালবের মধ্যে আল্লাহর স্মরণকে স্থায়ী করা সম্ভব। অবশ্য এ জন্য প্রয়োজন আল্লাহর সাহায্য। আর যারা তাঁর স্মরণকে বুলন্দ করার জন্য খাস দিলে অগ্রসর হবে তাকে তিনি সাহায্য করবেন বলে আশা করা যায়।

পার্থিব জীবনে উত্তম ও আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ আঞ্জাম দিতে জিকরুল্লাহর মতো উৎকৃষ্ট কিছু নেই। জিকরুল্লাহর মধ্যে নিমগ্ন ব্যক্তিরাই আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনে সক্ষম হন। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবিরত আল্লাহর জিকির করতেন। এ কারণেই সেই ব্যক্তিকে তিনি উপদেশ দান করেছিলেন যে অভিযোগ করেছিল, ইসলামের বিধানাবলী আমার জন্য কঠিন, 'তুমি তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে সর্বদা ব্যস্ত রেখো'। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্যই অনেকসময় তাঁর সাহাবীদের (রিদ্বওয়ানাল্লাহি তা'আলা আজমাঈন) বলতেন: "আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম একটি কাজের কথা বলবো, যা আমাদের প্রতিপালকের নিকট

সর্বাপেক্ষা পবিত্র, যা সোনা-রূপা দান করার চেয়েও উত্তম, যে কাজ জিহাদে গিয়ে তোমাদের দুশমনদের কতল করার চেয়েও মর্যাদাশীল? তা হলো, জিকরুল্লাহ" [তিরমিযী, আহমাদ, হাকিম]।

আল্লাহর স্মরণ মানুষকে দোযখের অগ্নি থেকেও রক্ষা করবে। হযরত মুআদ ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য জিকরুল্লাহ থেকে কার্যকরী আর কোন কিছু নেই" [আহমাদ]। অন্য একটি হাদীসে আছে: "আল্লাহর মাহাত্ম্য ও প্রশংসা করতে যেয়ে তোমরা যা কিছু বলো তা আল্লাহর আরশ মুবারকের চতুর্দিকে তওয়াফ করতে থাকে। এসব শব্দ মৌমাছির গুণগুণ শব্দের মতো উচ্চারিত হয়। যে এগুলো উচ্চারণ করছে তার জন্য তা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে থাকে। তোমরা কি ইচ্ছা করো না যে, এভাবে কেউ তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে থাকুক?" [আহমাদ]।

জিকিরের পরিমাণ কি হবে, এ প্রশ্নের সহজ জবাব হলো যতটুকু সম্ভব জিকির করা যাবে। কেউ যদি অনবরত জিকির পড়ে তবে তো উত্তম কিন্তু অন্তত সাধ্যমতো যতো বেশী পারা যায় তা করা একা জরুরী। কারণ আল্লাহ তাআলা বেশী বেশী জিকির পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: ঐসব লোক যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে [৩১:৯১]। অর্থাৎ, সর্বাবায় সর্বক্ষণ জিকির যারা করে তাদেরকে তিনি পছন্দ করেন। অন্যত্র বলা হয়েছে: ঐসব পুরুষ ও নারী যারা আল্লাহর প্রশংসায় অতিমাত্রায় নিমগ্ন। তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও বিরাট পুরষ্কার রেখেছেন [৩:১৯১, ৩৩:৩৫]।

ফিকহ আস-সুন্নাহর লেখক বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বলেন, কোন ব্যক্তি উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তির মতো হতে পারে না যদি না সে সর্বদা আল্লাহর জিকির করে- দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে। এই আয়াত সম্পর্কে একটি রিওয়ায়েতে হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেছেন, মানবের প্রতি যতোটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে (ইবাদতসহ) তা পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট

করা হয়েছে। বিশেষ কোন কারণবশতঃ এসব দায়িত্ব থেকে মানুষকে অব্যাহতিও দেওয়া হয়েছে [যেমন, হায়েজ অবস্থায় মহিলাদের নামায মাফ] কিন্তু জিকিরের ক্ষেত্রে তা স্বতন্ত্র। জিকিরের জন্য আল্লাহ তাআলা কোন সীমাবদ্ধতা রাখেন নি এবং তা পড়ার ক্ষেত্রে কোন ধরণের যৌক্তিক অজুহাতও গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বাবস্থায় জিকির পড়তে হবে। জিকিরকে উপেক্ষা করা নিষিদ্ধ। আল্লাহকে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, সকালে, বিকেলে, সাগরে এবং মাটির উপর চলার সময়, সফরে, বাড়িতে, নিঃস্ব ও সচ্ছল অবস্থায়, পীড়িত ও সুস্বাস্থ্য অবস্থায়, প্রকাশ্যে ও গোপনে- এককথায়: জীবনভর সর্বাবস্থায় স্মরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, অতিরিক্ত বা সীমাহীন জিকির বলতে কিছু নেই। জিকির যতো বেশী করা হবে ততোই লাভ, ক্ষতির কোন আশংকা নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কেউ কোন কিছু ভালোবাসে সে ঐ বস্তুর কথা বেশী বলে" [আবু নাঈম, মুসনাদ আল-ফিরদাউস]।

আমরা আল্লাহকে অবশ্যই ভালোবাসি এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও। সুতরাং জিকির করার সীমা যদি কেউ নির্দিষ্ট করে দেয় তবে সে মুসলমান হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, শায়খ তাঁর শাগরিদকে জিকিরের তালিম ও অভ্যাস শিক্ষা দিতে গিয়ে হয়তো বলতে পারেন, ফজরের নামাযের পর এই পরিমাণ এই এই জিকির পড়বে, মাগরিব পরে অনুরূপ করবে ইত্যাদি। এটা সালিককে জিকিরের প্রতি বেশী থেকে বেশী আকৃষ্ট করার জন্য করা হয়। সালিক যদি অতিরিক্ত জিকির করতে থাকে তবে শায়খ কখনো তাকে নিষেধ করবেন না। বাস্তবে জিকিরকে যারা সীমাবদ্ধ করে দেয় তারা ইসলামের দুশমন। কারণ, আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল রাখার অর্থ হলো মানুষকে বিপথগামী করা। আর মুসলমানকে জেনেশুনে যারা বিপথগামী করে তারা ইসলাম ও মুসলমানের দুশমন ছাড়া আর কি হতে পারে?

জিকিরের ফজিলত বর্ণনা করতে যেয়ে ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জগতখ্যাত গ্রন্থ এহিয়া উলূমুদ্দীনে বলেন, মানবের আত্মা (রূহ) ও প্রাণই হচ্ছে তার আসল প্রকৃতিগত দিক। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার

অবার পরিবর্তন ঘটে দু'টি দিক দিয়ে। প্রথমতঃ এখন তার চোখ, কান, হাত, জিহ্বা, পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অকেজো হয়ে পড়েছে। এছাড়া পরিবার, সন্তানাদি, স্বজন এবং যাদেরকেই সে জানতো-চিনতো, তার ঘোড়া এবং অন্যান্য আরোহণ জন্তু, তার চাকর-নকর, বাড়ি, সম্পত্তি এবং যতো কিছুরই সে মালিক ছিলো, তা তার জন্য সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে ও অকেজো হয়ে যায়। এখানে তাকে আলাদা করা হয়েছে বা তার সবকিছু তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে, এরূপ কোন ধারণা মূল্যহীন। কারণ, এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আসল কথা হলো এই আলাদাকরণের ফলে সে বেদনায় পতিত হয়েছে। এই পৃথিবীতে থাকাকালীন সে যদি এমন কোন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে যা থাকে শান্তি দিতো, তাহলে সে বস্তু হারিয়ে ভীষণ দুঃখ পাবে। তার হৃদয়ে ঐসব জিনিষের অভাব অনুভুত হবে যা সে নিজের বলে মনে করতো। তার ক্ষমতা, ধন-সম্পদ এমনকি একটি প্রিয় জামার কথাও তার হৃদয়ে জাগ্রত হয়ে তাকে দুঃখিত করবে। কিন্তু সে যদি আল্লাহর জিকিরের মধ্যে শান্তি অনুভব করে থাকে এবং নিজের মনকে একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট করে সান্ত্বনা খুঁজে থেকে থাকে, তাহলে এই মৃত্যু হবে তার জন্য বিরাট নিয়ামত ও খুশীর কারণ। কারণ, তখন তো সে ও তার প্রেমাস্পদের মধ্যকার পর্দা উন্মোচিত হয়ে যাবে। সে তখন পার্থিব জামেলা ও দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে। এসব বস্তুই তাকে জিকরুল্লাহ থেকে গাফিল রেখেছিল। জীবন মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্যের এটা হচ্ছে একটি দিক।

মিফতাহুল জান্নাহ্‌র লেখক ইমাম হাবীব আল-হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: তারিখ ও সময় হচ্ছে মানুষের মূলধন। অপরদিকে তার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও অন্যান্য উচ্চাভিলাষ হলো রাজপথের ডাকাত। একমাত্র আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের মাধ্যমেই এই ভ্রমণে লাভবান ও অনন্তকালের জন্য সুখ-শান্তি নিশ্চিত করা যায়। অপরদিকে আল্লাহ থেকে দূরে থাকলে বিরাট ক্ষতি এবং আগুনের ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে পতিত হতে হয়। এসব কারণে, বুদ্ধিমান ঈমানদার ব্যক্তি তার প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর আনুগত্যের উপর কাটিয়ে দেয় এবং একমাত্র কিজরুল্লাহর মাধ্যমে তা ভঙ্গ করে। অর্থাৎ শরীয়তসম্মত যাবতীয় ইবাতাদ করে এবং সর্বদা নিজেকে আল্লাহর স্মরণে ডুবিয়ে রাখে।

জিকিরে ক্বালবী বা নিঃশব্দে জিকরুল্লাহর গুরুত্ব

আমার শায়খ কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমিনউদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, তোমরা প্রতিটি শ্বাস-নিঃশ্বাসে আল্লাহকে স্মরণ করো। এরজন্য জিহ্বা নাড়ানো বা কোন শব্দ উচ্চারণের প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র শ্বাস গ্রহণের সময় ধারণা করবে 'আল্লাহ' এবং নিঃশ্বাসের সময় ধারণা করবে 'হু'। তিনি আরও বলেছেন, সুফিয়ায়ে কেরাম মনে করেন, মানুষের একটি শ্বাসও যদি আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল অবস্থায় চলে যায়, তবে তা কুফরীতে নিমজ্জিত হয়ে চলে গেলো।

ফিকহ আস-সুন্নাহর লেখক বলেন, জিকিরের মাধ্যমে হৃদয় (ক্বাল্‌ব) ও আত্মাকে (রূহকে) পরিষ্কার করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ "এবং নামায কায়েম করো, কারণ নামায মানুষকে ঘৃণিত ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহর স্মরণ (কিজরুল্লাহ) হচ্ছে সর্বোত্তম কাজ" [২৯:৪৫]।

অন্যকথায়, ব্যক্তিকে পাপকার্য থেকে বিরত রাখতে, আল্লাহর জিকির, নির্দিষ্ট নামায অপেক্ষাও উত্তম। এর কারণ হলো, বান্দাহ যখন আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে প্রতিপালকের নিকট তার আত্মাকে খুলে দেয় তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র নূর দ্বারা স্বীয় বান্দাহর হৃদয়কে আলোকিত করে দেন। এতে তার ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং মন-হৃদয় সন্তুষ্ট হয়। এ ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ "যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের হৃদয় আল্লাহর জিকিরে সন্তুষ্ট, কারণ নিঃসন্দেহে আল্লাহর জিকিরেই চিত্ত হয় প্রশান্ত" [১৩:২৮]।

মানবের হৃদয় যখন সত্যের আলোকে প্রশান্ত হয়ে উঠে, তখন জাগতিক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি কোনো আকর্ষণ অবশিষ্ট থাকে না। মানুষ তখন উচ্চতর নৈকট্যের আকাঙ্ক্ষায় আরও বেশী করে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়। জিকির মানুষকে এরূপ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করে।

যে উচ্চ পর্যায়ের জিকিরের কথা এখানে বলা হচ্ছে তা শুধুমাত্র জিহ্বা দ্বারা কিছু শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে সম্ভব নয়। কারণ জিহ্বা যা বলে তার সঙ্গে মনের বা ক্বালবের মিল না থাকলে তা মূল্যহীন। সুতরাং হৃদয় দ্বারা নিঃশব্দে আল্লাহকে স্মরণ করার নাম হলো আসল জিকির। তবে ঈমানসহ

মুখে উচ্চারণের মধ্যেও ফায়দা আছে। নীরবে নিঃশব্দে জিকির করার জন্য স্বয়ং রাব্বুল আলামীন নির্দেশ নিয়েছেন। তিনি বলেন:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

-"এবং আপনার আত্মার মধ্যে স্বীয় প্রতিপালকের জিকির বুলন্দ করুন বিনয় ও শ্রদ্ধাসহ, সশব্দহীনভাবে সকালে ও বিকেলে এবং তাদের মতো হবেন না যারা অমনোযোগী" [৭:২০৫]।

উক্ত আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, নীরবে নিঃশব্দে ক্বালবী জিকির হলো উন্নতমানের জিকির। একদা ভ্রমণকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল মুসলমানকে দেখলেন তারা সশব্দে জিকির করছেন। তিনি তাদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমরা কিছুক্ষণের জন্য কান্ত হও। তোমরা তো এমন কাউকে ডাকছো না যিনি অনুপস্থিত কিংবা বধির। নিশ্চয়ই তোমারা যাকে ডাকছো তিনি তোমাদের অতি নিকটে এবং তোমাদের (মনের) কথা শোনেন। তিনি তো তোমাদের শাহরগ থেকেও নিকটে" [মুসলিম শরীফ]।

জিকিরের প্রতি ভালোবাসা এবং একই সঙ্গে ভয়ের ব্যাপারটি এই হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়েছে। আমরা যা ভাবি তা আল্লাহ শোনেন বা বুঝেন। সুতরাং জিকিরকালে এটাই ভাবতে হবে, তিনি সব শোনছেন। আমাদের ভুল-ত্রুটি থেকেও তিনি কোন সময়ই গাফিল নন। হযরত সা'দ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "সর্বোত্তম জিকির হচ্ছে গোপন জিকির এবং সর্বোত্তম টাকা হলো যাকিছু যথেষ্ট" [মুসনাদে আহমাদ, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী]।

নকশবন্দীয়া তরীকার মুরিদদের ক্বালবী জিকিরের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশী। তরীকার প্রতিষ্ঠাতা শাহ বাহাউদ্দীন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: জিকিরের দুটি পথ: এক, সশব্দে এবং দুই, নিঃশব্দে। আমি নিঃশব্দে জিকির পছন্দ করেছি এ কারণে যে, এটা শক্তিশালী (বেশী প্রভাবশীল) সুতরাং বেশী পছন্দনীয়।

শায়খ আমীন আল-কুর্দী তাঁর প্রণীত গন্থ তানবীরুল কুলুব-এ লিখেছেনঃ জেনে রাখো, জিকির হচ্ছে দু প্রকারঃ এক, হৃদয় দিয়ে (ক্বালবী) এবং দুই জিহ্বা দ্বারা (লিসানী)। কুরআন ও সুন্নাহ উভয়ের মধ্যে এর আইনসঙ্গত দলীল বিদ্যমান। জিহ্বার জিকির যাতে শব্দ ও অক্ষরসমূহ জড়িত, সর্বদা করা সহজ নয়। কারণ, ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য অনুরূপ কার্যাবলী এরূপ জিকির করা থেকে মানুষকে সরিয়ে নেয়। হৃদয়ের জিকিরের ক্ষেত্রে এর বিপরীত কথাই সত্য। এটাকে এ কারণেই ক্বালবী জিকির বলে, যেহেতু এটা শব্দ ও অক্ষর থেকে মুক্ত। কোন কিছুই মানুষকে এরূপ জিকির থেকে গাফিল করতে পারে নাঃ হৃদয় দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করো, সৃষ্টি থেকে গোপনে থেকে, নিঃশব্দে, অকথিত জিকির। এই জিকিরই সর্বোত্তম জিকিরঃ এ থেকেই বেরিয়ে এসেছে আউলিয়াদের মুখ থেকে অসংখ্য উপদেশ বাক্যাবলী।

মানব হৃদয় বা ক্বালব হচ্ছে একটি বিশেষ স্থান। এখানেই শান্তি-অশান্তি অনুভুত হয়। আল্লাহর রাহমাত পতিত হওয়ার ক্ষেত্র হচ্ছে ক্বালব। এই স্থানই মানুষের ঈমানের মূল, এ স্থানই সকল রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু। মানবিক গুলাবলী ও নূরে হাক্বিকাত ক্বালবের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। সুতরাং এই ক্বালব যার যতো বেশী উত্তম ও পরিষ্কার হবে সেই ব্যক্তিও ততো বেশী কামিয়াব হবে। অর্থাৎ ক্বালব যদি ভালো থাকে তাহলে সমস্ত মানুষটিই ভালো, আর মন্দ থাকলে সমগ্র মানুষটিই খারাপ হয়ে যায়।

নীরবে জিকিরের সুফল সম্পর্কে একটি বিশেষ হাদীস আছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ "আল্লাহ পাক জিকিরের উপর জিকির ৭০ গুণ বেশী পছন্দ করেন [অর্থাৎ সরব অপেক্ষা নীরব জিকির প্রভুর কাছে বেশী পছন্দনীয়]। রোজ কিয়ামতে সকল মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, মুনকার-নকীর ফিরিশতাদ্বয় প্রত্যেকের আমলনামা নিয়ে আসবেন। আল্লাহ পাক ফিরিশতাদ্বয়কে বলবেন, দেখতো তোমরা আমার বান্দার কোন আমল লিখতে ভুলে গিয়েছিলে কি না? তারা বলবেন, আমরা যা শুনেছি ও দেখেছি তা সবই লিপিবদ্ধ করেছি। আল্লাহ বলবেন, হে আমার বান্দাহ! আমার নিকট তোমার ভালো একটি জিনিস রক্ষিত আছে যার জন্য আজ আমি তোমাকে পুরস্কৃত করবো। এটা হলো গোপনে আমার

স্মরণ, যা তুমি করেছিলে” [বাইহাকী]। হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে আছে: “মুনকার-নকীর ফিরিশতারা যে জিকির শুনতে পান না তার মূল্য ৭০ গুণ বেশী” [বাইহাকী]।

মোটকথা, নীরবে ক্বালবী জিকির হচ্ছে সর্বোত্তম জিকির। তাসাওউফের সব তরীরকায় সকল সালিককেই এই উচ্চতর জিকির করার উদ্দেশ্যে তালিম দেওয়া হয়। দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণকে জাগ্রত রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে ক্বালবী জিকির। তবে এ জিকির সহজে জারী হয় না। এর জন্য সাধনার প্রয়োজন এবং সর্বোপরি আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া এই জিকির স্থায়ী করা সম্ভব নয়।

সাধনার রাস্তায় নির্জনবাসের অভ্যাস

জিকির সরবে কিংবা নীরবে তখনই সঠিকভাবে করা সম্ভব যখন মানুষ নির্জনে অবস্থান করে। সুতরাং এই উদ্দেশ্যেই তরিকতপন্থীরা নির্দিষ্ট কিছু সময় নির্জনবাসে কাটিয়ে দেন। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে: আবু সাইয়্যিদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা এক বেদুঈন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে হাজির হয়ে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানবকুলের মধ্যে কে সর্বোত্তম? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, “যে ব্যক্তি তার জীবন ও সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে এবং ঐ ব্যক্তিও যে বাস করে (একা) পর্বতাঞ্চলে একটি পাহাড়ী রাস্তায় তার প্রভুর উপাসনা-কল্পে এবং (ঐ ব্যক্তিও যে) নিজের কুকর্ম থেকে -গোত্রকে নিরাপদে রাখে” [বুখারী শরীফ]।

হযরত আবু সাইয়্যেদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে আছে, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “কোন এক সময় আসবে যখন একজন মুসলমানের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হবে তার বকরী। তার নিজের ধর্মকে রক্ষা করতে এটাকে নিয়ে সে দূরে পাহাড়ে আরোহণ করবে এবং বৃষ্টি যেসব স্থানে পতিত হয় সেখানে যাবে” [বুখারী]।

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হুমায়িদ ইবনে মালিক ইবনে কুসাইম রাদ্বিআল্লাহু আনহু আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু-কে সঙ্গে

নিয়ে তাঁর নিজস্ব ভূমি আল-আকিবে অবস্থান করছিলেন যখন একদল লোক মদীনা মুনওয়ারা থেকে তাঁর নিকট আসলো। তারা আরোহী থেকে নেমে কাছে এলো। হুমায়িদ বলেনঃ "আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু আমাকে বললেন, আমার মায়ের নিকট গিয়ে বলো, তোমার ছেলে সালাম প্রেরণ করেছে এবং তোমার সাথে আমাদের জন্য কিছু খাবার প্রেরণ করার অনুরোধ জানাও। আমি গেলাম এবং তিনি (আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এর মাতা) আমার নিকট তিন টুকরো রুটি, কিছু জায়তুন তৈল ও সামান্য লবণ দিলেন। আমি এসব নিয়ে আসলাম। আমি যখন এগুলো তাদের সামনে রাখলাম তখন আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহু আকবার! যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে রুটি দান করেছেন এমন এক সময় যখন আমাদের খাবার ছিলো দু'টি কালো জিনিসঃ পানি ও খেজুর। আগন্তকরা কিছুই রাখলো না, সব ভক্ষণ করলো। তারা চলে যাওয়ার পর আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! তোমার বকরীগুলোর প্রতি সদয় হবে, তাদের গা থেকে পিচ্ছিল বস্তু মুছে দেবে, চারণভূমি পরিষ্কার রাখবে এবং তাদের কাছে থেকে উপাসনা করবে কারণ, এগুলো হচ্ছে বেহেশতের জন্তু। যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, এমন এক দিন আসবে যখন একদল বকরী তার মালিকের নিকট মারওয়ানের পুত্রদের [অর্থাৎ মানবগোষ্ঠির] চেয়েও প্রিয় হবে" [মুয়াত্তা ইমাম মালিক]।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে আছে, তিনি বলেন, একদা মক্কার পথে জুমদান (স্থানে হিমায়িত) নামক পাহাড়ের উপর দিয়ে যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সিরু! দ্রুত চলো! এটা হলো জুমদান পাহাড় এবং মুফাররিদুন (একক-মননের লোকেরা) অগ্রগামী"। তারা (সাথীরা) বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুফাররিদুন কারা? তিনি জবাব দিলেনঃ "যেসব নারী ও পুরুষ আল্লাহকে স্মরণ করে" [মুসলিম শরীফ]।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত একই হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "মুফাররিদুন হচ্ছেন অগ্রগামী"। তারা বললেনঃ মুফাররিদুন কারা? তিনি বললেন, "যারা আল্লাহর জিকির

করে ও এজন্য তিরষ্কৃত হয় এবং জিকির যাদের দায়িত্বকে সরিয়ে দেয় সুতরাং, তারা আল্লাহর নিকট আসে উড়ন্ত অবস্থায়"।

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুসলিম শরীফের শরায় লিখেছেন, কেউ কেউ উচ্চারণ করে, মুফরিদুন যার অর্থ হলো, যারা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। ইবনে কাইয়ূম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং অন্যান্যরা বলেছেন, মুফরিদুনের অর্থ হলো, যারা আত্মীয়-স্বজন হারিয়েছে এবং তথাপি একা হয়েও আল্লাহর জিকির করে। অন্য এক রিওয়ায়েতে আছেঃ মুফরিদুন তারা যারা আল্লাহর স্মরণে বিভোর, অর্থাৎ তারা সর্বদা আল্লাহর স্মরণে ডুবে থাকে। শাইখুল আকবর ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, এটা বলা হয়ে থাকে যে, যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করে সে একা হয়ে যায়, সে নির্জনে বাস করে সর্বদা আল্লাহর নির্দেশ ও আদেশ-নিষেধ পালন করতে থাকে।

নির্জনে জিকির সম্পর্কে একটি হাদীসে আছে, সাত ব্যক্তি আল্লাহর পবিত্র ছায়ার মধ্যে অবস্থান করবে। সপ্তম ব্যক্তি হলো ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহকে নির্জনে থেকে স্মরণ করে এবং তার চোখদ্বয় অশ্রুতে ভেসে যায় [বুখারী শরীফ]।

হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের প্রাথমিক দিনগুলোতে, যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর ও বান্দাদের উপর মর্যাদা দান করার ইচ্ছা করেছিলেন তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন ধরণের অন্তর্দৃষ্টি হতো না ঐসব ছাড়া যা ছিলো সূর্যোদয়ের মতো পরিষ্কার। তিনি যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো ততদিন পর্যন্ত এভাবে দিন কাটান। এসময় তিনি একা থাকতে (নির্জনতা অবলম্বন) বেশী পছন্দ করতেন। একা থাকার চেয়ে অন্য কিছুই তাঁর কাছে এতো প্রিয় ছিলো না" [তিরমিযী শরীফ]।

হাফিজ ইবনে হাজর আল-আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রণীত গ্রন্থ ফাতহুল বারীতে নির্জনতা অবলম্বন সম্পর্কে বলেন, কিতাব আর-রাক্বাইক-এ ইবনে মুবারক বর্ণনা করেন, উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেছেনঃ নির্জনতার মহামূল্যবান সম্পদের অংশ তুমি গ্রহণ করো। জুনাইদ

বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্য কতো সুন্দর, তিনি বলেছেনঃ সমাজে নিজেকে রক্ষা করে মিশে যাওয়া যতোটুকু কঠিন তার চেয়ে সহজ সাধনা হচ্ছে নির্জনবাস।

তিরমিযী শরীফের শরায় শাইখুল আকবর আবু বকর ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেনঃ যদি বলা হয় যে, এমন একটি সময় এসেছে যখন সমাজ এতোই কলুষিত হয়েছে, নির্জনবাস ছাড়া আর ভালো কিছুই করার নেই তখন আমরা বলিঃ কেউ যেন নিজেকে কর্মের ক্ষেত্রে নির্জনতা অবলম্বন করে এবং শারীরিকভাবে সবার সঙ্গে মিলে-মিশে চলে। কিন্তু এতেও যদি সে সফল না হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে সে নিজেকে সশরীরে দূরে সরিয়ে নেবে কিন্তু সন্যাস জীবনে নয়, কারণ সন্যাসবাদ শরীয়তসম্মত নয়।

'আল্লাহ' নামের জিকির

আল্লাহ পাক তাঁর কালামে করীমে ইরশাদ করেনঃ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

-"এবং আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন।" [৭৩:৮]। কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াত সম্পর্কে তাঁর লিখিত কিতাব, তাফসিরে মাযহারী-তে বলেন, জেনে রাখো এই আয়াত ইসমে জাতের (আল্লাহ নামের) জিকিরের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللّٰهُ اللّٰهُ

-"যতক্ষণ পর্যন্ত 'আল্লাহ!' 'আল্লাহ!' বলার মানুষ এই ধরায় অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ পর্য মহাপ্রলয় ঘটবে না" (সুনানে তিরমিযি)। অন্যত্র এই হাদীসের বর্ণনা এসেছে এভাবেঃ

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُول اللّٰهُ اللّٰهُ

-"কোন ব্যক্তির উপর কিয়ামত ঘটবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে বলতে থাকবে: আল্লাহ! আল্লাহ!" [মুসলিম]। সুতরাং আল্লাহ, আল্লাহ জিকিরের মর্তবা বিরাট।

একইভাবে হু (ه), হাইয়্যু (حي) এবং হাক্ব (حق) নামের জিকির পড়াও উত্তম। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

-"সর্বাপেক্ষা সুন্দর নামের অধিকারী আল্লাহই; সুরতাং তাঁকে এসব নামে ডাকো [৭:১৮০]। এছাড়া আল্লাহর ৯৯টি উত্তম গুণবাচক নাম স্মরণ রাখলে ও পাঠ করলে বিরাট ফায়দার কথা হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

-"আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে, একশ থেকে এক কম, যে কেহ এগুলো মুখস্ত (পাঠ) করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে" [বুখারী, মুসলিম]। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে দুআ করতেন: আল্লাহুম্মা ইন্নি আদউকা বি আসমাইকাল হুসনা কুল্লাহা - "হে আল্লাহ! আমি আপনাকে আপনার যাবতীয় সুন্দর নাম নিয়ে ডাকছি" [ইবনে মাজাহ, মুয়াত্তা ইমাম মলিক]।

হু শব্দের অর্থ তিনি এবং হাইয়্যু ও হক্ব আল্লাহর দুটি গুণবাচক নাম। কুরআন শরীফে হু শব্দ এসেছে এভাবে: اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ - "আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই- (যিনি) চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী" [২:২২৫]। ২. বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ৯৯টি গুণবাচক নামের মধ্যে 'হাক্ব' ও 'হাইয়্যু' দু'টি নাম। এছাড়া স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করতেন: ১, লাব্বাইকা ইলাহুল হাক্ব -আপনার শিরোধার্য হে সত্য আল্লাহ! ২. আল-হাক্ব -আপনিই মহাসত্য [বুখারী, মুসলিম]। এসব শব্দ উচ্চারণ করে তাঁকে স্মরণ করলে লাভ ছাড়া কোন ক্ষতি নাই।

হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু 'আহাদ' (احد) নামের জিকির করতেন তা সবার জানা কথা। কুরাইশ কাফিরদের চরম নির্যাতনকালে তাঁর

পবিত্র মুখ দিয়ে এই শব্দটিই বের হতো। ইবনে ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রণীত সীরাতগ্রন্থে বলেছেন, বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু পবিত্র চিত্তশীল ঈমানদার মুসলমান ছিলেন। উমাইয়া ইবনে খালাফ তাঁকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার উপর দিনের দুপুরে চিত করে পুঁতে রেখে বুকের উপর ভারী পাথর তুলে রাখতো। এরপর সে বলতো, মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধর্ম পরিত্যাগ করে লাত আর উয্যার উপাসনা না করা পর্যন্ত তোমাকে মৃত্যুর পূর্ব অবধি এভাবে থাকতে হবে। কিন্তু [ঈমানের পবিত্র নূরে দীপ্ত] বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রতিউত্তরে বলতেন: আহাদ!, আহাদ! [ইবনে হাজর আল-আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদীসটি তাঁর প্রণীত গ্রন্থ আল-ইসাবায় বর্ণনা করেছেন।

অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে জিকরুল্লাহ

আল্লাহ পাক রাসূল সাল্লালহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন,

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ

-"এবং রাত্রির কিছু অংশ কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন" [১৭:৭৯]।

হাদীস শরীফ ও ফিকহ শাস্ত্রে রাতের বেলা ইবাতদের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ হলো এসময় মানুষ জাগতিক বিভিন্ন সমস্যাবলী ও একাগ্রতা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে মুক্ত থাকে। এ কারণেই প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: চিন্তার মূল হলো চক্ষু। যার নিয়ত খালেস এবং ধ্যান উচ্চ পর্যায়ের তাকে তার সামনে যা কিছুই ঘটুক না কেন অন্যমনস্ক করতে পারে না। কিন্তু যার নিয়ত ও ধ্যান দুর্বল সে সহজেই এসবের শিকার হয়। এর ঔষধ হচ্ছে উল্লেখিত সকল ধ্যানভঙ্গকারী বস্তুর মূলোৎপাটন করা এবং চোখ দুটো বন্ধ করে দেওয়া, অন্ধকার কক্ষে উপাসনা, সামনে কোন কিছু না রাখা যা তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে এবং কোন কারুকাজবিশিষ্ট কক্ষে উপাসনা না করা। এসব কারণেই সুফীগণ অন্ধকার, ছোট্ট কক্ষে বসে উপাসনা করতেন [এহিয়া উলূমুদ্দীন]।

জিকিরের সময় শরীর নড়াচড়া করা

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: একটি হাদীসে আছে, তারাই ঐসব লোক যারা আল্লাহর নাম শুনলে কিংবা স্মরণ করলেই কেঁপে উঠে বা নড়ে উঠে, অর্থাৎ তারা তাঁর স্মরণে বিভোর হয়ে তাঁর প্রতি আকর্ষিত হয়ে যায়। ইমাম হাবীব আল-হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মিফতাহুল জান্নাহ গ্রন্থে লিখেছেন: জিকির বাইর থেকে ভেতরের দিকে হৃদয়ের মধ্যে গিয়ে ভিত্তি স্থাপন করে এবং এর প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় বিস্ত ারলাভ করে। এই জিকিরের মিষ্টতা ঐ ব্যক্তিই অনুভব করে যে তা তার নিজের দেহ ও হৃদয়সহ করতে থাকে। এতে তার দেহের চামড়া ও হৃদয় তরল হয়ে উঠে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: তাদের হৃদয় ও চর্ম আল্লাহর জিকিরে কোমল হয়ে যায় [৩৯ঃ২৩]।

হৃদয় কোমল হওয়ার মানে হচ্ছে নৈকট্য ও স্পর্শ যার মাধ্যমে পয়দা হয় তাজাল্লি। আর তাজাল্লি অর্থ হলো পবিত্র ঐশি নামের প্রভাব। জাকেরীনের মধ্যে এ ভাবের জন্ম নেয় যে, সঙ্গী হিসেবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট এবং সর্বোত্তম।

চর্ম কোমল হওয়ার অর্থ হলো জিকিরের মাধ্যমে 'হালের' অবস্থা সৃষ্টি এবং হরকত (একদিক থেকে আরেক দিকে দেহ নড়াচড়া করা) পয়দা হওয়া যা একাগ্রতা ও নৈকট্য থেকে আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়া এর সঙ্গে জড়িত আছে আল্লাহর প্রতি খাওফ (বা ভয়) সৃষ্টি। এরূপ উচ্চ পর্যায়ের জিকিরকারী হরকত করেন ও সময় সময় সজোরে চিৎকার দিয়ে থাকেন। এসব কাজের জন্য তাকে কোন মতেই দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না কারণ, এসব কাজ তার নিজের ইচ্ছায় হয় না, বাস্তবে এগুলো হলো জিকিরের তাজাল্লি ও প্রভাবের ফল। তাছাড়া আল্লাহর প্রেমিকরা প্রেমের গভীরে গিয়ে বিরহ-বিলাসের অনন্ত ঢেউয়ের মধ্যে ভাসতে থাকেন। তাদের চিৎকার ও হরকত সেই প্রেমের খেসারত বৈ কিছু নয়। একবার যে এই প্রেমে পড়েছে সে জানে এর চরম বিরাহ যাতনা এবং নৈকট্যের অসীম আনন্দের মুহূর্তগুলো। এসব ব্যাপার ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

হাদীস শরীফে জিকিরের মাহাত্ম্যের বর্ণনা

জিকরুল্লাহর গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি হাদীস লিপিবদ্ধ করা হলো।

১. হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে সময় আল্লাহর কোন বান্দাহ একাগ্রচিত্তে বলে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, তখন আকাশের সকল দরজাসমূহ এই শব্দগুলোর জন্য খুলে যায় যতক্ষণ পর্য না তা আরশ মুবারক পর্যন্ত পৌঁছে। তবে এই ব্যক্তিকে অবশ্যই কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকতে হবে" [তিরমিযী]।

২. হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের বিশ্বাসকে পুনর্গঠন করো, তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) আরজ করলেন, আমাদের বিশ্বাসকে আমরা কিভাবে পুনর্গঠন করবো? তিনি জবাব দিলেন, সর্বদা বলবেঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ" [আহমদ]।

৩. হযরত জাবির [রাঃ] থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "সর্বোত্তম জিকরুল্লাহ হচ্ছে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ হলো আলহামদুলিল্লাহ" [নাসাঈ, ইবনে মাযাহ এবং হাকিম]।

৪. আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "দুটি বাক্য আছে যা জিহ্বার জন্য হালকা কিন্তু মহান এক আল্লাহর নিকট প্রিয়। এগুলো হলোঃ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ [মহিমান্বিত আল্লাহ এবং তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা] এবং سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ [মহান মহিমান্বিত আল্লাহ] [বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী]।

৫. আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আরো একটি হাদীস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ

-"আমি বার বার বলতে ভালোবাসি: সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, সকল সূর্যরশ্মি থেকেও অতিমাত্রায়" [মুসিলম, তিরমিযী]।

৬. আবু যর গিফারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ যেসব শব্দ সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন তা কি আমি তোমাকে বলবো?, তিনি (আবু যর) বললেন, হ্যাঁ বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আল্লাহর নিকট প্রিয় কথাগুলো হলো: "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ)" [মুসলিম]। তিরিমিযী শরীফে একই হাদীসে ভাষ্য হলো, "সুবহানা রাব্বি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানা রাব্বি ওয়া বিহামদিহী (سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ)"।

৭. হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "স্থায়ী উত্তম কাজগুলো করতে থাকো। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, এসব স্থায়ী উত্তম কাজগুলো কি? তিনি জবাব দিলেন: তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাহলিল (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ) তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), আলহামদুলিল্লাহ এবং লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ [নাসাঈ, হকিম]।

৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: রাতের ভ্রমণকালে (মিরাজের রাতে) ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় যিনি আমাকে বললেন: হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনার উম্মতদের প্রতি আমার সম্ভাষণ জানাবেন এবং বলবেন, জান্নাত হলো পবিত্র ভূমি, এর পানি মিষ্টি এবং এর বিস্তৃতি বিরাট, বিস্তৃর্ণ ও সমতল। এর চারাগুলো হচ্ছে: সুবহানাল্লাহি ওয়াআলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াআল্লাহু আকবার [তিরমিযী ও তাবারানী]।

৯. সামুরা ইবনে যুনদুব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি কোন লোক সূরা বাক্বারার শেষ দুটি আয়াত তিলাওয়াত করে তবে তার জন্য তা-ই যথেষ্ট" [বুখারী, মুসলিম]।

১০. আবু সাইয়্যিদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "রাতের বেলা তোমাদের মধ্যে কেউ কি কুরআন শরীফের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে পারবে? সাহাবায়ে কেরাম এব্যাপারে চিন্তা করলেন এবং বললেন, আমাদের মধ্যে কে এমনটি করতে পারে ইয়া রাসূলাল্লাহ? এর পরিপ্রেক্ষিতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ, তিনি একক [অর্থাৎ সূরা ইখলাস] এটা হলো কুরআন শরীফের এক-তৃতীয়াংশ" [বুখারী, মুসলিম]।

১১. হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কেউ দৈনিক একশ বার বলে, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদ, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর [আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই। তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান], দশজন দাস মুক্তির সমপরিমাণ সওয়াব তার আমলনামায় লিখা হবে। এছাড়া একশটি নেকী তার আমলনামায় লিখা হবে এবং একশটি গুনাহ কাটা যাবে। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি শয়তানের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকবে এবং কেউই আমলের ক্ষেত্রে তার চেয়ে উত্তম কাজ করতে পারবে না যদি না এরচেয়েও বেশী আমল কেউ করতে সক্ষম হয়" [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ]।

উক্ত হাদীস শরীফ সম্পর্কে মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ শরীফের বর্ণনায় নিম্নোক্ত অতিরিক্ত কথাগুলো আছে:

"কেউ দৈনিক একশ বার বলে: সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহী, তার সকল গুনাহ মুছে ফেলা হবে তা যদি সমুদ্রের ফেনার মতোও বিপুল হয়ে থাকে।

তছবিহ্‌র ব্যবহার

গাটযুক্ত তাসবীহ বা অন্য কোন উপায়ে জিকির ও ইস্তিগফার গণনা করে পড়ার ক্ষেত্রে কেউ কেউ বলেন, এটা বিদআত। কিন্তু বাস্তবে এরূপ করা

মোটেই বিদআতের অন্তর্ভূক্ত নয়। এ ব্যাপারে তিনটি হাদীস শরীফের উদ্ধৃতিই প্রমাণরূপ যথেষ্ট।

হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মহিলাকে দেখলেন যার কাছে কিছু পাথর কিংবা খেজুরের বিচি জমাকৃত ছিল। তিনি এসব আল্লাহর গুণগান করতে যেয়ে ব্যবহার করছিলেন [অর্থাৎ এগুলো দিয়ে গণনা করে করে তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করছিলেন]। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এ উপায় থেকেও আরো সহজ ও উত্তম পন্থা আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। এই কথা বলে তিনি একটি দুআ পাঠ করলেন [আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ, হাকিম]। মূল হাদীসে পুরো দোয়াটিও উল্লেখিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মহিলাকে গণনা করে করে তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেন নি। অর্থাৎ এটা বিদআত কিংবা গুনাহর কাজ এমন কথা বলেন নি বরং মহিলাকে এর চেয়ে সজহ পন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন।

অপর একটি হাদীসে আছে, হযরত সাফিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন। আমার সামনে তখন চার হাজার খেজুরের বিচি ছিলো। এগুলো দিয়ে আমি তাসবীহ করছিলাম। তিনি বললেনঃ "তুমি এতো বেশী তাসবীহ করছো! তবে আমি কি তোমাকে শিক্ষা দিব যা এই বিপুল সংখ্যক তাসবীহ অপেক্ষাও উত্তম? তিনি (সাফিয়া [রাঃ]) বললেন, আমাকে শিক্ষা দিন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "বলো, সুবহানাল্লাহ আদাদা খালক্বিহি [আল্লাহর সৃষ্টির যাবতীয় সংখ্যা পরিমাণ প্রশংসা তাঁর প্রতি] [তিরমিযী, হাকীম। ইমাম সুয়ুতী এই হাদীসকে সহীহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।] এখানেও উল্লেখ্য যে গণনা করে তাসবিহ করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেন নি বরং সাফিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু-কে সহজভাবে অতিরিক্ত সওয়াবের পন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীস ইমাম শওকতি তাঁর গ্রন্থ নায়লাল আওতার-এ উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

"নিমাল মুযাক্কিরাল সিবহা" অর্থাৎ "উপাসনার গোটাগুলো কতো উত্তম স্মরণকারী!" একই হাদীস ইমাম জালালুদ্দিস সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর রচিত হাবিলিল ফাতওয়াহ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

সুতরাং তাসবীহ দিয়ে জিকির-আজকার করা মোটেই বিদআত নয়। এ প্রসঙ্গে আরও একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে রাখা জরুরী মনে করছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হযরত আবু সাফিয়্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর সামনে একটি চাটাই বিছিয়ে দিতেন। এরপর ছোট ছোট পাথর ভর্তি একটি ঝুড়ি আনা হতো। তিনি সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এসব পাথর গুণে গুণে তাসবীহ পাঠ করতেন। এরপর এটা সেখান থেকে উঠিয়ে নেওয়া হতো। সন্ধ্যায় তা আবার আনা হলে তিনি পুনরায় রাত পর্যন্ত পাথর গুণে গুণে তাসবীহ জপ করতেন। এই বর্ণনাটি ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর রচিত গ্রন্থ ইসাবায় লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, ইমাম বুখারীও এই রিওয়ায়েতটি তাঁর তারিখ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম বগভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও এটা বর্ণনা করেছেন।

ইবনে সাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাবাক্বাত গ্রন্থে বলেন, সাদ ইবনে ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং ফাতিমা বিনতে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহা যথাক্রমে পাথর ও সুঁতার মধ্যে গ্রন্থি তৈরীর মাধ্যমে গণনা করে করে তাসবীহ জপতেন। এছাড়া জগতখ্যাত মুজতাহিদ ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পাথর দ্বারা তাসবীহ তৈরী করে তা ব্যবহার করেছেন।

সুতরাং দেখাই যাচ্ছে তাসবীহ দিয়ে গণনা করে আল্লাহর গুণগান করা দোষের কিছুই নয়। সাহাবায়ে কিরাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বহুসংখ্যক আলিম-উলামা ও আল্লাহর প্রিয়জন এই তাসবীহ ব্যবহার করে আসছেন।

পরিচ্ছেদ ৫

তরীকার পরিচিতি

আল্লাহর জিকিরের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি এবং এতে প্রমাণ হয়েছে যে, যারা জিকির করার ক্ষেত্রে সুফিয়ায়ে কেরামের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন করে তা মূলত ভ্রান্ত। জিকরুল্লাহ করতে যেয়ে সশব্দে, নিঃশব্দে, একাধিক ব্যক্তি বসে একত্রে এবং তাসবীহ দিয়ে গুণে গুণে করার মধ্যে কোন দোষ নেই। সুতরাং যারা এসব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তারা আসলে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন উপকার করছে না। আজকের এই জঠিল-কঠিন ও ধার্মিকতার দিক থেকে গরীব পরিবেশে জিকরুল্লাহ তথা ইলমে তাছাউফের দিকে মানুষকে বেশী করে ধাবিত করা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং ঐসব আধ্যাত্মবিরোধী তথা তাছাওউফবিরোধীদের কথায় কান না দিয়ে জিকরুল্লাহর পরিবেশকে সর্বত্র বিস্তৃত করা একান্ত কাম্য।

আগেই বলেছি, সুফিয়ায়ে কেরাম জিকির-মুরাক্বাবার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের বিভিন্ন রাস্তা দেখিয়ে গেছেন। সুতরাং এবার সুফিয়ায়ে কিরামের ঐসব বিভিন্ন তরীকা (রাস্তা) সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি। কোন এক হিসেব মতে পৃথবীতে অন্তত ৮০টি ভিন্ন সুফি তরীকা আছে। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কটি হলোঃ

১. ইউসুফিয়া - প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ ইউসুফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২. কুবরাবিয়া- প্রতিষ্ঠাতা শেখ নিযাম উদ্দিন কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩. কাদিরিয়া- প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্দুল কাদীর জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৪. রিফায়ী- প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ রিফায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৫. মাওলাবিয়া- প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৬. বেকতাশিয়া- প্রতিষ্ঠাতা হাজী বেকতাশ ভেলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৭. নকশবন্দীয়া- প্রতিষ্ঠাতা হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৮. বাইরামিয়া- প্রতিষ্ঠাতা হযরত বাইরাম ভেলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৯. চিশতিয়া- প্রতিষ্ঠাতা হযরত আবু ইসহাক শামী চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
১০. মুজাদ্দিদীয়া- প্রতিষ্ঠাতা হযরত আহমাদ সিরহিন্দ মুজাদ্দিদে আলফে-সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
১১. শাদিলিয়া- প্রতিষ্ঠাতা হযরত আবুল হাসান আল-শাদিলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
১২. নিয়ামতুল্লিয়া- প্রতিষ্ঠাতা হযরত শাহ নিয়ামতুল্লাহ ভেলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
১৩. তিজানিয়া- প্রতিষ্ঠাতা হযরত আহমাদ আল-তিজানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
১৪. মুরিদিয়া- প্রতিষ্ঠাতা হযরত আহমাদ বামবা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রভৃতি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

আমাদের উপমহাদেশে চারটি তরীকা প্রসিদ্ধ। এগুলো হলো কাদিরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া ও মুজাদ্দিদিয়া। এই চার তরীকার জিকির-আজকার ও মুরাক্বাবার পদ্ধতি নিয়ে নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হলো। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, তরীকতপন্থীদেরকে অবশ্যই স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশ মুতাবিক জিকির-মুরাক্বাবা করতে হবে। নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে জিকির আজকার করার পূর্বে নিজ মুর্শিদের অনুমতি গ্রহণ করা জরুরী। এখানে ইলমে মা'রিফত তথা খোদাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুফিয়ায়ে কেরাম কিসব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন বা করছেন সেসব কথাই পাঠকদের বলে দেওয়া উদ্দেশ্য। এই বই তরীকতের ছবক মোটেই নয়- তরীকতের ছবক স্বীয় মুর্শিদের কাছ থেকেই নিতে হবে।

সুফিদের দৃষ্টিতে জিকিরের অর্থ

এ পর্যন্ত জিকিরকে আল্লাহর স্মরণ অর্থেই আমরা ধরে নিয়েছি। কিন্তু তরীকতপন্থীদের নিকট জিকিরের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। বাহ্যিকভাবে জিকিরের অর্থ হলো- স্মরণ করা, বার বার শব্দাবলী উচ্চারণ করে গুণগান

করা ইত্যাদি। সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, জিকির বাস্তবে একটি বিশেষ উপায় যার মাধ্যমে হৃদয় বা আত্মা বিভিন্ন মাক্বাম (مقام -অবস্থান) অতিক্রম করে ঊর্ধ্বলোকের দিকে অগ্রসর হয়ে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলে সক্ষম হয়। জিকিরের সর্বশেষ লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্বের বাস্তব উপলব্ধি। সুতরাং জিকির দু ধরণের- এক. মনের জিকির এবং দুই. হৃদয়ের জিকির। প্রাথমিক পর্যায়ে তরীকতের সালিকরা এ দুটোর কোন একটি থেকে অন্যটিতে উপনীত হন। তবে কোন কোন সময় এই দুয়ের সমন্বয় ঘটে যা হলো সর্বোত্তম জিকির। জিকির খোলা ও গোপনও হয়ে থাকে। খোলা জিকিরের অর্থ হচ্ছে দৈহিক (جسادى) এবং গোপনটি হলো আত্মিক (روحانى)। মোটকথা সুফিয়ায়ে কেরামের নিকট জিকির হলো আল্লাহকে অনুভব করার নাম। এজন্য উচ্চ পর্যায়ের সাধকরা বলেছেন, জিকির-মুরাক্বাবার মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহকে অনুভব করেছেন সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানের জন্য বই-পুস্তক কিংবা দর্শনের কোন প্রয়োজন নেই। যাকে অনুভব করা হয়েছে- তার সম্পর্কে জানার জন্য কি আরো কিছুর দরকার পড়ে? আর আল্লাহকে জানা তথা মা'রিফাত (معرفة) হাসলিই হলো মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য। যে আল্লাহকে জেনে নিতে পেরেছে সে কি আর কোনদিন বে-ঈমান হতে পারে? এছাড়া তাঁর মতো বড় ঈমানদার হওয়া কি সম্ভব?

জিকরুল্লাহ সম্পর্কে কিছু আহরিত বাণী

সুফিরা দিবারাত্রির প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণে ডুবে থাকতে সদা-উদ্গ্রীব। তাঁরা বলেন, প্রতিটি শ্বাস-নিঃশ্বাস যিকরুল্লাহর মধ্যে অতিবাহিত হতে হবে। আল্লাহর স্মরণ হলো তরীকাত তথা সুলুকের রাস্তার সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহিত জিকিরুল্লাহ সম্পর্কে কিছু অমর বাণী নিম্নে পাঠকদের উপহার দিচ্ছি।

"বলো 'আল্লাহ!' তারপর তাদেরকে তাদের বোকামির হাসিঠাট্টার মধ্যে রেখে দাও" [আল-কুরআন]

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

“এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।” [আল-কুরআন, ২০:১২৪]।

اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

“আল্লাহর স্মরণে তাদের চামড়া ও হৃদয় নরম হয়ে যায়” [আল-কুরআন, ৩৯:২৩]।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

“আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ কবরো” [আল-কুরআন, ২:১৫২]।

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

“যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে ..” [আল-কুরআন, ৩:১৯১]।

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়” [আল-কুরআন, ১৩:২৮]।

“যা কিছুর মধ্যে মরিচা পড়ে তার জন্য পালিশ আছে; এবং হৃদয়ের পালিশ হলো যিকরুল্লাহ” [আল-হাদীস]।

“যারা আল্লাহর জিকির করে ও যারা করে না তাদের মধ্যে পার্থক্য হলো জীবিত ও মৃত, অর্থাৎ যাকিরীন জীবিত ও গাফিল মৃত” [আল-হাদীস]।

"বেহেশতবাসীর কোন চিন্তা-ভাবনা থাকবে না, কিন্তু দুনিয়ায় থাকতে যেটুকু সময় তারা আল্লাহর জিকির ব্যতীত কটিয়েছে সে ব্যাপারে আক্ষেপ করবে" [আল-হাদীস]।

"আল্লাহর জিকিরের অর্থ হলো, তাঁকে স্মরণ করতে যেয়ে অন্য যে কোন বস্তুকে একেবারে ভুলে যাওয়া" [হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আল্লাহর জিকির মানুষকে রাস্তায় চলার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে দেয়ঃ এটাই তাদেরকে মুসাফিরে পরিণত করে" [হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"যে শ্বাস আল্লাহর নাম ছাড়া বের হলো তা একটি নিষ্ফলা শ্বাস" [সুফি উক্তি]।

"আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীতে ১ লক্ষ ২৪ হাজার পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন একটি মাত্র শব্দের দাওয়াত দিতে। আর এই শব্দটি হলো 'আল্লাহ!'। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর উপাসনা করতে দাওয়াত দিয়েছেন। যারা এই শব্দটি শুধুমাত্র কানে শোনেছে, তা তাদের অপর কান দিয়ে বের হয়েছে; কিন্তু যারা এই শব্দটিকে তাদের রূহ দ্বারা শ্রবণ করেছেন, এটা তাদের রূহকে আলোকিত করেছে এবং এই শব্দের জিকিরে ডুবে গেছেন। এরপর জিকির করতে করতে শব্দের উচ্চারণ থেকেও তারা স্বাধীন হয়েছেন। শব্দ ও অক্ষরের ঊর্ধ্বে উঠে এসে তারা এক অপূর্ব অবস্থার মধ্যে জিকিরে লিপ্ত থাকেন। এই জিকিরের ফলে তারা নিজেদের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে গেছেন- তারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর মাঝে ফানা হয়েছেন" [হযরত আবুল ফজল মুহাম্মদ ইবনে হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আল্লাহর আমানত হিসাবে মহাসত্য মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত করা হয়েছে। এটা মানুষের দায়িত্ব যে, এই আমানতের হিফাজত করা। মহাসত্য উন্মুক্ত হয় খাঁটি তাওবাহ ও আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এর সৌন্দর্য বাইরে এসে সবকিছু আলোকোজ্জ্বল করে তোলে যখন বান্দা আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত

হয়। প্রাথমিক অবস্থায় 'আল্লাহ' নামের জিকির করা হয় জিহ্বার দ্বারা; যখন হৃদয় জাগ্রত হয়ে ওঠবে তখন এই জিকির অভ্যন্তরীণভাবে উচ্চারিত হবে" [হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা তাঁর এক মুরীদকে বললেন: "পূর্ণ এক দিনের জন্য একবারও না থেমে 'আল্লাহ! আল্লাহ! আল্লাহ!' জিকির করার চেষ্টা করো। এরপর পরের দিন, এর পরের দিনও যাতে এই নামের জিকির তোমার মধ্যে স্থায়ী হয়ে যায়।" এরপর তিনি বললেন, "রাতের বেলাও জিকির করবে।" মুরীদ মুর্শিদের নির্দেশ মতো জিকির করতে করতে এমন অবস্থায় উপনিত হলেন যে, তিনি ঘুমের মধ্যেও 'আল্লাহ! আল্লাহ! আল্লাহ!' জিকির করতে লাগলেন। এরপর তসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "এবার আর এই নামের জিকির সর্বদা করো না, কিন্তু তোমার যাবতীয় চেতনাকে তাঁর স্মরণে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দাও।" মুরীদ তা-ই করলেন। এতে তার যাবতীয় চিন্তা-চেতনায় শুধুমাত্র আল্লাহর ধ্যান-ধারণা স্থায়ী হয়ে গেল। একদা এক টুকরো লাকড়ি তার মাথায় পড়ে গেল, এতে মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগলো। মাটিতে রক্ত পড়ে তা জিকির করতে লাগলো, 'আল্লাহ! আল্লাহ! আল্লাহ!' [হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

একদা একজন সাধক আল্লাহকে আকুল হয়ে ডাকছিলেন এমন সময় শয়তান এসে হাজির হয়ে বললো, 'আপনি আর কতদিন 'হে আল্লাহ!' বলে ক্রন্দন করবেন? এবার খামোশ হয়ে যান, আপনি কোন জবাব পাবেন না।"

সাধক চুপ করে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি হযরত খিজির আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, "ওহে! তুমি কেন আল্লাহকে ডাকা থেকে বিরত হলে?"

সাধক বললেন, "কারণ, 'এই তো আমি' বলে কোন জবাব এখনও আসে নি"।

খিজির (আঃ) বললেন, "আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমার নিকট এসে বলে দিতে: 'আমি কি একে আমার উপাসনার জন্য ডাক দেই

নি? আমিই কি তাকে আমার নামে জিকির পড়তে ব্যস্ত রাখি নি? তার কণ্ঠে 'আল্লাহ!' নামের ডাকই ছিলো আমার 'এই তো আমি', কথন। তার আকাঙ্ক্ষার বেদনা আমার বার্তাবাহক তার নিকট। ঐসব অশ্রু এবং তাওবাহর ক্রন্দনের আমিই তো ছিলাম চুম্বক, এবং আমিই এদেরকে পাখা দান করেছিলাম।" [হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"কালিমা তায়্যিবাহর জিকির সর্বাপেক্ষা বড়ো ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' এক পাল্লায় ও সমস্ত জগৎ অপর পাল্লায় তুলে দেওয়া হয় তবে অবশ্যই কালিমা তায়্যিবাহর পাল্লা ভারী হবে" [হযরত আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"কোন এক ঐশীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে আল্লাহ পাক বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতদেরকে আমি দু'টি জিনিস দান করেছি যা ফিরিশতা জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ:) -কেও দান করি নি: এর প্রথমটি হলো আমার প্রতিশ্রুতি- তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। অপরটি হলো, আমি ওয়াদা করেছি তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো" [হযরত মালিক দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আমি তোমাকে ডাক দিচ্ছি ... না, না, তুমিই আমাকে নিজের নিকট ডেকে নিচ্ছো। আমি কিভাবে বলবো, 'এ হয় তুমি!' তুমি যদি আমাকে বলতে না, 'এ হয় আমি?'" [হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"যে আমাকে স্মরণ করে আমি তার সাথী" [হাদীসে কুদসী]।

"যে কেউ আমাকে হৃদয়ের মধ্যে স্মরণ করে, আমি তাকে আমার হৃদয়ের মধ্যে স্মরণ করি। আর যে কেউ আমাকে স্মরণ করে কোন মজলিশের মধ্যে, আমি তাকে একটি উত্তম মজলিশের মধ্যে (অর্থাৎ ফিরিশতাদের সঙ্গে) স্মরণ করি" [হাদীসে কুদসী]।

"গ্বাইরুল্লাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যে কেউ আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত হবে, সে শোনতে পাবে সকল প্রাণীর জিকিরের আওয়াজ। মনে হবে যেনো ওহী নাজিল হচ্ছে! মাগরিবের নামাজ থেকে রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত আমি এই অভিজ্ঞতা অনুভব করেছি। আমি শোনতে পেলাম প্রাণীরা আল্লাহর প্রশংসা করছে উচ্চ স্বরে, সুতরাং আমি ভাবলাম হয়তো আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু না, তা ছিলো বাস্ত ব। আমি শোনেছি সাগরের মাছগুলো বলছে, "যাবতীয় প্রশংসা মহামহিম বাদশাহর জন্য, যিনি সর্বাপেক্ষা পবিত্র, মহান প্রতিপালক" [হযরত যুননুন মিশরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"জিকির অর্থ আল্লাহ ছাড়া সবকিছু ভুলে যাওয়া" [হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তাওবাকারী থেকেও বেশী আমি দান করি যে ব্যস্ত থাকে আমার স্মরণে, যদিও সে কিছু পাওয়ার আবদার করে না" [আল-হাদীস]।

"প্রেমাস্পদ আল্লাহকে তোমার হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত রাখো। তোমার হৃদয়ের উপাসনা হয়ে যাক যিকরুল্লাহ" [হযরত আব্দুল খালিক গুজদাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"জিকিরের বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন দিক আছে। কোনো জিকির সশব্দে পড়া হয় যার নাম জিকিরে জলি। কোনো জিকির হলো অভ্যন্তরীণ যাকে জিকিরে খফী বলে। এই জিকির আসে হৃদয়ের কেন্দ্র থেকে। প্রাথমিক অবস্থায় জিকিরে জলি করা জরুরী। এরপর স্তরে স্তরে জিকির পুরো দেহে বিস্তার করে শেষে হৃদয়ের কেন্দ্রে এসে স্থায়িত্ব লাভ করবে। এখান থেকে রূহের মধ্যে তা বিস্তার করে গোপন লতীফাসমূহে ছড়িয়ে পড়বে। এরপর গোপন থেকে গোপন স্থানে পৌঁছে যাবে। কতটুকু গভীরে যেয়ে তা বিস্তার লাভ করবে তা নির্ভর করে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর" [হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"জিকির হলো, বাস্তব ক্ষেত্রে হৃদয়ের মধ্যে নামের ক্রমবর্ধমান শক্তি, এরপর জিকির স্বয়ং ক্ষয় হয়ে যায়" [ইমাম আবু হামিদ গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আমি তোমাকে সর্বদা স্মরণ করি, তোমাকে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা হেতু নয়; এটা আমার জিহ্বা থেকে এমনিতেই বেরিয়ে আসে" [হযরত যুননুন মিশরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"প্রত্যেকটি দিবসে মহান প্রভু ডাক দিয়ে বলেন, "হে আমার বান্দা! তুই আমার সঙ্গে বেশ নিমকহারামী করলি। আমি তোকে সর্বদা স্মরণ করি আর তুই আমাকে ভুলে যাস্। আমি তোকে আমার নিকট আসতে দাওয়াত দিচ্ছি কিন্তু তুই অপরের নিকট ছুটে যাস্!"" [হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ভুলে যাওয়ার মধ্যে যে বিরাট বেদনা নিহিত তা বুঝতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নৈকট্যশীল স্মরণের মধ্যে যে কী বিরাট আনন্দ বিদ্যমান তার স্বাদ পাবে না" [হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"সবকিছুর মধ্যে শাস্তি আছে। সুফির শস্তি হলো তাকে জিকির থেকে গাফিল করা" [হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আল্লাহ যখন তাঁর কোনো বান্দাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে নিতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি তাঁর জিকিরের দরজা তার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। জিকিরের স্বাদ অনুভব করানোর পর তিনি তার জন্য স্বীয় নৈকট্যের দরজা খুলে দেন। তারপর তিনি তাকে নিজের কাছে তুলে নেন। একত্বের মহান আসনে তাকে অধিষ্ঠিত করার পর তার পর্দা উন্মোচন করে দেন। এবার যখন এই বান্দার দৃষ্টিতে মহান প্রভুর মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব ধরা দেয় তখন সে তার নিজের অস্তিত্ব থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিছু সময়ের জন্য তাঁর বান্দা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। এরপর সে আল্লাহর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার

অধিকারী হয়, সে তখন 'নিজ' বা নফসের সকল কার্যাদি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত" [হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"মা'রিফাতপন্থীদের ইবাদাত হলো, 'পাস-আনফাস' অর্থাৎ প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাসের পাহারা দেওয়া" [হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"একটি পশু মারা যায় এবং একটি বৃক্ষ কর্তন করা হয় যখন তাদের জিকরুল্লাহর মেয়াদ শেষ হয়ে যায়" [হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু]।

"তোমার হৃদযন্ত্রের প্রতি খিয়াল রেখো" [হযরত ওয়ায়িস কারণী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]

"আল্লাহর জিকির দ্বারা একটি মাত্র লতীফাও যদি আলোকিত হয়ে যায় তাহলে বাকী সব লতীফা এর প্রভাবে আলোকিত হবে" [হযরত জালালুদ্দীন কবিরুল আওলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"ঠাণ্ডা পানি পান করো, লোমে লোমে 'আলহামদুলিল্লাহ' বেরিয়ে আসবে" [হযরত জালালুদ্দীন কবিরুল আওলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আশীর্বাদপূর্ণ যৌবনকাল অত্যন্ত মূল্যবান; আল্লাহর জিকিরের সুন্দর রঙে একে রঙ্গীন করে তুলো" [হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"তোমার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ আল্লাহর জিকির ও দ্বীনের খিদমাতের মধ্যে অতিবাহিত করো। মৃত্যু এবং এর পরবর্তী অবস্থা থেকে গাফিল হয়ো না" [হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আল্লাহর জিকিরের অর্থ হলো, তাঁকে স্মরণ করতে যেয়ে অন্য সকল বস্তু একেবারে ভুলে যাওয়া" [হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"কে ডাকবে কাকে? ডাবকো যাকে কোথায় সে থাকে? তোমরা বলো হৃদয়ের মধ্যে সেজন, কে খুঁজে দেখবে সেথা তাঁকে? ওখানে তো দু'জনের স্থান নেই- তাহলে? তাহলে শুধু তাঁকেই থাকতে দাও! 'আমি' এখনও অস্তিত্ব হারাই নি- প্রমাণ? এই তো! কে এসব কথা লিখছে?" [বক্তা অজানা]।
(সূত্রঃ লেখক কর্তৃক প্রণীত 'প্রেমের পথের অমৃত বাণী' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

বিভিন্ন তরীকার জিকির-মুরাক্বাবা

জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহকে জানা যায়, আল্লাহর মা'রিফাত হাসিল হয়। সুফিয়ায়ে কেরাম, জিকিরের মাধ্যমে সফলতা অর্জনের জন্য কিছু তরীকা বা বিশেষ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এসব পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হলেও বাস্তবে সবগুলোই একই জিনিষ। আর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেতো একবিন্দুও তারতম্য নেই- সবাইকেই সর্বোচ্চ মাক্বামে যেয়ে উপনিত হওয়া তথা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করাই আসল উদ্দেশ্য।

লতীফার পরিচিতি

জিকির করার ক্ষেত্রে প্রথমেই শরীরের মধ্যে স্থাপিত লতীফা (সূক্ষ্মবস্তু) ক'টি ও এগুলো কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিত তা জেনে নিতে হবে। বিভিন্ন তরীকা অনুযায়ী লতীফাসমূহের নাম একই হলেও শরীরের কোথায় এদের অবস্থান সে ব্যাপারে ভিন্নমত বিদ্যমান। আমরা নিম্নে চিশতিয়া-কদিরীয়া এবং নকশবন্দীয়া-মুজাদ্দিদীয়া তরীকানুযায়ী লতীফাগুলোর পরিচিতি তুলে ধরছি।

১. লতীফায়ে ক্বালব (قَلْبٌ): এই লতীফা মানবদেহের হৃদযন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর অবস্থান বায়ের স্তনের দু'আঙ্গুল নীচে কিছুটা বুকের দিকে। এই লতীফাকে জিকিরের মাধ্যমে শক্তিশালী করে তুললে জিকির করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই লতীফার নূর লাল রংয়ের।

২. লতীফায়ে রূহ (روح): মানব আত্মার সঙ্গে এর সম্পর্ক। এর অবস্থান ক্বালবের বিপরিত দিকে অর্থাৎ ডান স্তনের নীচে কিছুটা বুকের

দিকে। এই লতীফার জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি মন সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ঠ হয়। এই লতীফার নূর সাদা।

৩. লতীফায়ে সিররি (سر): এই লতীফা বাম স্তনের দুই আঙ্গুল উপরে কিছুটা বুকের দিকে অবস্থিত। এই লতীফার জিকিরি থেকে কাশফ (আধ্যাত্মিক দিব্যদৃষ্টি) সৃষ্টি হয়। এই লতীফার নূরের রং হলো সবুজ।

৪. লতীফায়ে খফি (خفى): এই লতীফা চিশতিয়া ও কাদিরীয়াদের মতে কপালের সিজদার স্থানে অবস্থিত। নকশবন্দীয়া ও মুজাদ্দিদীয়াদের মতে এর অবস্থান ডান স্তনের দুই আঙ্গুল উপরে কিছুটা বুকের দিকে। এই লতীফার জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর দীদার নসীব হয়। অর্থাৎ হাক্বিকাতের নূর এই লতীফায় প্রতিবিম্ব হয়। এই লতীফার নূর হলো নীল রংয়ের।

৫. লতীফায়ে আখফা (اخفى): এর অবস্থান চিশতিয়া ও কাদিরীয়া তরনীকানুযায়ী মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে তালুর নরম স্থানটিতে। অপরদিকে নকশবন্দীয়া ও মুজাদ্দিদীয়াদের মতে এর অবস্থান ক্বালব ও রূহের মধ্যস্থলে অর্থাৎ বুকের কড়ির নীচে। আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব ও নৈকট্য অর্জন এই লতীফার জিকিরের মাধ্যমে হাসিল হয়। এটার নূর হলো কালো।

৬. লতীফায়ে নফস আন-নাতিক্বা (نفس): এই লতীফার অবস্থান চিশতিয়া ও কাদিরীয়া তরীকানুযায়ী নাভীমূলে। অন্যদকে নকশবন্দীয়া ও মুজাদ্দিদীয়া তরীকানুযায়ী এর অবস্থান হলো কপালের মধ্যস্থলে সিজদার স্থানে। এই লতীফার কাজ হচ্ছে মানবাত্মাকে প্রভাবিত করা। এই লতীফার জিকির মানুষকে উচ্চ পর্যায়ে উপনীত করে এবং পবিত্র আত্মার অধিকারী বানায়। এটার নূর হলদে রংয়ের।

৭-১০. লতীফায়ে আব (পানি), আতশ (আগুন), খাক (মাটি) ও বাদ (বাতাস): এই লতীফাগুলোর অবস্থান মানবদেহের সর্বত্র বিরাজমান। এই লতীফার জিকিরকে সুলতানুল আজকার বা বড় জিকির বলা হয়। এই লতীফার জিকিরের মাধ্যমে মানবদেহের প্রতিটি কোষে জিকরুল্লাহর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। কোন কোন অলিআল্লাহ বলেছেন, সুলতানুল আজকার মূলত চারটি লতীফার সমন্বয়ে ঘটিত- যেমন আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস। এগুলো হলো মানবদেহের মৌলিক উপাদান। সুতরাং এসবের খিয়াল করে

জিকির করার অর্থ হলো সমস্ত দেহ দিয়ে জিকির করা। এই জিকির অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের জিকির। এটা অতি সহজে হসিল করা সম্ভব নয়। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তরীকতপন্থীরা চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে সুলতানুল আজকার হাসিল করতে সক্ষম হয়ে থাকেন।

উপরোক্ত প্রতিটি লতীফার মধ্যে যে ভিন্ন ধরণের নূর বিদ্যমান তার আরো ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সালিক যখন এসব লতীফার দিকে গভীরভাবে মনোনিবেশের মাধ্যমে জিকির করতে থাকেন তখন সময় সময় তার হৃদয়নেত্রে বা আত্মনেত্রে এসব নূর দেখতে পান। সুফিরা বলেন, এসব নূরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। উপরে বর্ণিত প্রথম ৬টি লতীফা হলো ঊর্ধ্ব জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ এগুলোর মূল আধ্যাত্মিক জগতে বিদ্যমান। সুফিরা বলেছেন, এই ৬টি পবিত্র লতীফার নূর আল্লাহপ্রেরিত ৬ জন প্রসিদ্ধ নবী (আলাইহিমুসসালাম)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এরা হলেন হযরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

লতীফায়ে ক্বালবে হযরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বরকত থেকে নূর আসে যার রং হলো লাল। এটা কাশফের মাধ্যমে দেখা যায় যা প্রথম আসমান থেকে অবতরণ করে। লতীফায়ে রূহের মধ্যে আসে হযরত নূহ ও হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বরকতে দ্বিতীয় আসমান থেকে উজ্জ্বল সাদা রংয়ের নূর। লতীফায়ে সিররি এর নূর হলো সবুজ রংয়ের। এটা আসে তৃতীয় আসমান থেকে হযরত মূসা (আঃ)-এর বরকতে। চতুর্থ আসমান থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বরকতে লতীফায়ে খফিতে পয়দা হয় নীল রংয়ের নূর। পঞ্চম লতীফা আখফার উপর পতিত হয় আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বরকতে কালো রংয়ের নূর। এই নূর এতোই শক্তিশালী যে, এর আলোতে অন্যান্য সবকটি লতীফার নূর প্রায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এই নূর এমক একটি আলোকবর্তিকা যে, এর প্রভাব ও ঔজ্জ্বল্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই নূরের মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক জগতের যা কিছু আল্লাহর ইচ্ছা তা

কাশফের মাধ্যমে সালিক দেখতে পান। প্রাথমিক পর্যায়ে এই নূরের তাজাল্লি সালিকের কাছে কিছুটা অস্পষ্ট মনে হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সালিক যদি সাধনায় নিজেকে আরো বেশী নিমগ্ন রাখেন তবে তা পরিষ্কার হয়ে উঠে।

সাধারণত নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া তরীকার জিকির হলো প্রায় একই ধরণের। অপরদিকে কদিরিয়া ও চিশতিয়া তরীকার জিকিরের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। আমরা প্রথমে কাদিরীয়া-চিশতিয়া তরীকার জিকির-মুরাক্বারা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

কাদিরীয়া ও চিশতিয়া তরীকার জিকির-মুরাক্বাবা

কাদিরীয়া ও চিশতিয়া তরীকার জিকির-মুরাক্বাবা প্রায় একই ধরণের। নকশবন্দীয়া ও মুজাদ্দিদীয়া তরীকায় খফী বা ক্বালবী জিকিরের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। কাদিরীয়া ও চিশতিয়া তরীকায় অন্তত প্রাথমিক অবস্থায় সালিকদেরকে জলী বা সশব্দে জিকিরের তা'লিম দেওয়া হয়। অবশ্য পর্যায়ক্রমে ক্বালবী জিকিরও করানো হয়ে থাকে।

কাদিরীয়া-চিশতিয়া তরীকায় জিকিরকে সাধারণত চারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলোঃ ১. জিকিরে নাসুতী (মানসিক)- এই জিকির হলো 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ)। ২. জিকিরে মালাকুতী (ফিরিশতা)- এই জিকির হচ্ছে 'ইল্লাল্লাহ' (إِلَّا اللّٰهُ)। ৩. জিকিরে জাবারুতী (আলমে জাবারুত)- এটা হলো 'আল্লাহু' 'আল্লাহ' (اللّٰهُ اللّٰهُ) নামের জিকির। ৪ জিকিরে লাহুতী (আলমে লাহুত)- এই জিকির হলো 'আল্লাহ' (اللّٰهُ)।

১. জিকিরে নাসুতীঃ জবান দ্বারা জিকির পড়াকে জিকিরে নাসুতী বলে। 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র জিকিরকে নফী ও ইসবাত বলা হয়। 'লা-ইলা-হা' এটুকু হলো নফী যার অর্থ বিলুপ্তি এবং 'ইল্লাল্লাহ' এই অংশ হচ্ছে ইসবাত যার অর্থ স্থিতি।

চিশতিয়া তরীকায় জিকিরে তেরো তাছবীহর নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এই নিয়মটি হলো জিকিরের পূর্বে গভীর রাতে দুই দুই করে বারো রাকাআত

তাহাজ্জুদের নামায আদায় করবেন। নামায শেষে অতি বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহর দিকে নিজের মনকে রুজু করে এই দোয়াটি তিন বা পাঁচবার পাঠ করবেন:

اللّٰهم طهر قلبى عن غيرك ونور قلبى بنور معرفتك أبدا يا الله يا الله يا الله

-"আল্লাহুম্মা তোয়াহহির ক্বালবী আন গ্বাইরিকা ওয়া নাওয়্যীর ক্বালবি বিনূরী মা'রিফাতিকা আবাদান, ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ!" -অর্থ: "হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত বাকী সবকিছু হতে আমার মন পাক করে দাও, তোমার মা'রিফাতের নূরে আমার ক্বালব আলোকিত করো সব সময়ের জন্য, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! হে আল্লাহ!"

এরপর ২১ বার তওবার নিয়তে এই দু'আ পড়ে নেবেন:

استغفر الله اللذى لآ إلٰه إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه

-"আস্তাগ্বফিরুল্লাহাল্লাজি লা-ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বায়্যুম ওয়া আতু-বু ইলাইহি" -অর্থ: "চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী মহান আল্লাহর নিকটই আমার সকল গুনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ বা মাবুদ নাই।"

এরপর খুব মনযোগ সহকারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবেন। এরপর চারজানু হয়ে ক্বিবলামুখী অবস্থায় বসবেন। বা পায়ের হাটুর মধ্যস্থিত 'কিমাস' নামক শিরাটিকে ডান পায়ের বুড়ী আঙ্গুল দ্বারা চেপে ধরবেন। সুফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন, এই শিরাটির সঙ্গে ক্বালবের সরাসরি সংযোগ আছে। এই অবস্থায় বসলে জিকিরের তাছির বা প্রভাব সরাসরি ক্বালবে পতিত হয়ে থাকে। বসা অবস্থায় দু'হাত দুই হাটুর উপর রাখবেন। এবার নিজেকে শান্তশিষ্ট রেখে ইখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে সুমধুর কণ্ঠে আউযুবিল্লাহ ... ও বিসমিল্লাহ ... শরীফ পাঠ করবেন। এরপর পুরো কলিমা তাইয়্যিবাহ ও কলিমা শাহাদাত একবার পড়বেন। এখন আপনি নফী ইসবাতের জিকিরের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। চোখ বন্ধ করে মাথা কিছুটা বুকের দিকে ঝুকিয়ে বাম হাটুর দিকে নেবেন। এই অবস্থায় 'লা-ইলাহা' উচ্চারণ করতে করতে ধীরে ধীরে মাথা উত্তোলন করে ডাক কাঁধের দিকে নিয়ে যাবেন। মনে মনে খিয়াল রাখবেন, আমি আমার ক্বালব থেকে গ্বাইরুল্লাহর যাবতীয় কিছু টেনে বের করে নিয়ে আসছি এবং পেছন দিকে ফেলে দিচ্ছি। এবার 'ইল্লাল্লাহ'

বলার সাথে মাথাকে আবার ক্বালবের দিকে অর্থাৎ বায়ের দিকে ঝুকিয়ে নেবেন ও মনে মনে খিয়াল করবেন, শুধু আল্লাহকে আমার ক্বালবে স্থান দিলাম এবং তাঁর নূর ও ইশ্‌কে আমার ক্বালব আপ্লুত হয়ে গেছে। মনে রাখবেন, 'লা-ইলা-হা' বলার সময় সবকিছু বিলুপ্ত (নফি) হয়েছে ভাববেন এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় সবকিছু আবার স্বস্থানে স্থিত (ইসবাত) হয়েছে। এরূপ ধারণা ও খিয়ালের মাধ্যমে অন্তত ২০০ বার ক্বালবে জরব (ধাক্কা) দেবেন। একসাথে ২০০ বার পাঠ না করে মাঝে মাঝে থেমে দু'একবার যে কোন দরূদ শরীফ পাঠ করবেন। জরব লাগাতে হবে ক্বালবের দিকে খিয়াল করে 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময়। এই জিকির এখানে যেভাবে বুঝিয়ে বলা হয়েছে তাতে তা কঠিন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। সঠিকভাবে পাঠ করলে অল্প সময়রের মধ্যেই এই জিকির করতে সক্ষম হবেন। ২০০ বার নফি-ইসবাত জিকির শেষে খুব ভাবগম্ভীরভাবে দু'একবার আস্তাগ্বফিরুল্লাহ ..., দরূদ শরীফ এবং 'আল্লাহু হাদ্বিরী (الله حاضري -আল্লাহ আমার নিকট উপস্থিত), আল্লাহু নাজিরী (الله ناظري -আল্লাহ আমার দ্রষ্টা), আল্লাহু শাহিদী (الله شاهدي -আল্লাহ আমার সাক্ষী), আল্লাহু মা'ঈ (الله معي -আল্লাহ আমার সাথী) পাঠ করবেন।

২. জিকিরে মালাকুতী: উক্ত নফী-ইসবাতের জিকির পরে কিছুসময় নীরব থেকে নিজের ক্বালবের দিকে খিয়াল করে বসে থাকবেন। এসময় ভাববেন, আল্লাহর মা'রিফাতের নূরের স্রোতদ্বারা মু'মিনের ক্বালবের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। এবার জিকিরে মালাকুতী অর্থাৎ 'ইল্লাল্লাহ'র জিকিরের জন্য প্রস্তুত হবেন। এই জিকির পড়ার পদ্ধতি হলো: মাথা ডান কাঁধের দিকে নিয়ে ফিরে এনে 'ইল্লাল্লাহ' বলে ক্বালবের উপর জরব বা ধাক্কা দেওয়া। মনে মনে খেয়াল করবেন, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে নেই। এই জিকির অন্তত ৪ শতবার করবেন। এরপর উর্বোল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বনে জিকির শেষ করবেন। এরপর কিছুক্ষণ গভীর ধ্যানসহ আল্লাহর নূর, ইশ্‌ক, মা'রিফাত ইত্যাদিই মহাসত্য ভাববেন।

৩. জিকিরে জাবারুতী: এটা হচ্ছে ইসমে যাত তথা 'আল্লাহু' ও 'আল্লাহ্' নামের জিকির। এটা পাঠের নিয়ম হলো: প্রথমে 'আল্লাহু' নাম উচ্চারণ করবেন এবং এসময় চোখ বন্ধ করে লতীফায়ে রূহের (ডান স্তনের দুই আঙ্গুল নীচে কিছুটা বুকের নিকেটে) দিকে মাথা ঝুকিয়ে জরব

লাগাবেন। এরপর 'আল্লাহ্' শব্দটি বলার সময় মাথাকে বাঁয়ের দিকে অর্থাৎ লতীফায়ে ক্বালবের দিকে ঝুকিয়ে ক্বালবের উপর জরব লাগাবেন। এই জিকিরের সময় আল্লাহর মূল গুণাবলী অর্থাৎ ইসমে সিফাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখবেন। অন্তত ৬০০ বার এই জিকির করবেন, যাকে সুফিয়ায়ে কিরাম জিকিরে দুই জরবী বলেন। জিকির করার সময় মাঝে মধ্যে থেমে উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে ইস্তিগফার, দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করবেন।

জিকির শেষে উপরোল্লিখিতভাবে ইস্তিগফার, দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করার পর নীরবে ক্বালবের দিকে খিয়াল করে কিছুক্ষণ মুরাক্বারা বা ধ্যানের মধ্যে বসে থাকবেন।

৪. জিকিরে লাহুতি: এই জিকির হচ্ছে ইসমে যাত বা 'আল্লাহ' নামের জিকির। একবার ক্বালবের উপর এর জরব লাগাতে হয়। এই জিকিরের সময় খুব নরম দিলে আল্লাহর অনুগ্রহের আশায় ক্রন্দনের ভাব সৃষ্টি করতে হবে। কেউ যেভাবে তার মহাব্বাতের পাত্রকে মায়ার চোখে দেখে ঠিক সেরূপ আল্লাহ তা'আলাও আপনাকে যাতে আশিক হিসাবে দেখেন সেই আশায় মনকে উদ্ভাসিত করে দিতে হবে। এই জিকির অন্তত ১০০ বার করতে হয়।

জিকির শেষে কিছুক্ষণ মুরাক্বাবার পর অত্যন্ত নরম দিলে কেঁদে কেঁদে কয়েকবার দরূদ শরীফ পাঠ করবেন। এরপর দু'আ করে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাবেন। কারণ, আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া আপনি এই জিকির করতে পারতেন না। এই পৃথিবীতে কত কোটি কোটি লোক জন্ম নিয়ে জীবন কাটিয়ে পরপারে চলে গেছে কিন্তু একদিনও এভাবে সে তাঁর প্রভুকে স্মরণ করে নি। আপনাকে যে আল্লাহ তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ করার তাওফিক দিয়েছেন, তার জন্য শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবেন কি? সুতরাং গভীর মনযোগের সহিত শুকরিয়া জ্ঞাপন করবেন। মা-বাবা, নিজের পীর এবং অলি-আবদালের জন্য খাস দিলে দু'আ করবেন এবং সর্বোপরি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবায়ে কিরামের প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করবেন। অতি শীঘ্রই আবার জিকিরে বসার নিয়ত করে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা চেয়ে দুআ শেষ করবেন।

উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে নিয়মিত তেরো তাসবীহের জিকির করলে ধীরে ধীরে জিকিরের স্বাদ অনুভূত এবং এর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে। তবে কাকে আল্লাহ পাক তাঁর মা'রিফাতের জ্ঞান দান করে ধন্য করবেন তা একমাত্র তাঁরই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এতে কারো কিছু বলার বা দাবী করার নেই। আমাদের কাজ হলো তাঁর ইশক, মহাব্বাত ও অনুগ্রহের আশা করা এবং সম্ভাব্য সব ধরণের চেষ্টা চালানো। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদের অর্ভূক্ত করুন। তাঁর প্রিয় হাবীবের প্রতি মহাব্বাত ও তাঁকে অনুসরণের তাওফিক দান করুন।

নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দিদীয়া তরীকার জিকির-মুরাক্বাবা

এই দুটি তরীকার মুর্শিদরা প্রথম থেকেই মুরীদকে জিকিরে খফির (অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দে বা ক্বালবী) দীক্ষা দিয়ে থাকেন।

নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দিদিয়া তরীকা অনুযায়ী ঊর্ধ্বলোকের দিকে আত্মার ভ্রমণ উপরোক্ত ৭টি লতীফার মাধ্যমে হয়ে থাকে। অর্থাৎ ইলমে মা'রিফাতের ৭টি স্তর অতিক্রম করা হয়। প্রথমেই সালিককে লতীফায়ে ক্বালবের জিকির করতে হবে। এটার মধ্যকার যাবতীয় কাশফ ও নূর পরিলক্ষিত হওয়ার পর তাকে পরবর্তী লতীফা- অর্থাৎ রূহের জিকিরে মনোনিবেশ করতে হবে। এভাবে সিররি, খফি, আখফা ও সুলতানুল আজকার পর্যন্ত যেতে হবে। সব লতীফার জিকির পূর্ণ হয়ে গেলে শুরু হবে মুরাক্বাবা।

মুরাক্বাবা শব্দের অর্থ ধ্যান। প্রথমতঃ হাদীস শরীফের মুরাক্বাবা দীক্ষা দেওয়া হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন হাদীসের মর্মার্থ অনুধাবন করতে যেয়ে মুরাক্বাবা করতে হয়। এরপর যথাক্রমে বিলায়েতে সুগরা, বিলায়েতে কুবরা, মুরাক্বাবায়ে ইসমে জাহির, মুরাক্বাবায়ে ইসমে বাতিন, কামালিয়াতে নুবুওয়াত, কামালিয়াতে রিসালাত, কামালিয়াতে আহলুল আজম, হাক্বিকাতে কাবা রব্বানী, হাক্বিকতে কুরআন, হাক্বিকতে নামায ইত্যাতি মুরাক্বাবা করতে হয়। এসব মুরকাবার লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন হাক্বিকাত অনুভব করা।

নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দিদিয়া তরীকার সালিক দৈনিক যেভাবে জিকির-মুরাক্বাবা করবেন তার একটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো।

জিকির শুরুর পূর্বে সালিক নিম্নলিখিত দু'আ-কালাম পাঠ করবেন:
(ক) তিনবার কলিমা শাহাদত।
(খ) ২৫ বার আস্তাগ্বফিরুল্লাহ।
(গ) সূরা ফাতিহা ১ বার।
(ঘ) সূরা ইখলাস ১১ বার।
(ঙ) সূরা নাস ১ বার।
(চ) লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ১০ বার। শেষের বার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহসহ।
(ছ) আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিন ওয়াআলা আলিহি ওয়াসাল্লিম এই দরূদ শরীফ ১০ বার।
(জ) সওয়াব রিসানী করা। অর্থাৎ উপরোক্ত দু'আ-কালাম থেকে যা সওয়াব আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করে দান করবেন তা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এবং আহলে আওলাদদের উপর বর্ষণ করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে ভিক্ষা চাইবেন। এছাড়া আপনার মুর্শিদের উপরও বর্ষিয়ে দেবেন।
(ঝ) এরপর আবার সূরা ফাতিহা পড়বেন।
(থ) এবার নিজের ক্বালবের দিকে খিয়াল করে মনে মনে বলবেন, হে আল্লাহ! আমার ক্বালব আমার পীর সাহেবের ক্বালবের উসিলায় আপনার দিকে নিবদ্ধ আছে। এরপর ১৫০০ বার 'আল্লাহ' নামের জিকির করবেন। এই কিজির খফি বা জলি যে কোনটাই হতে পারে। স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশানুযায়ী তা করবেন।
(ট) জিকির শেষে ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবেন।

এই প্রাথমিক জিকিরের মাধ্যমে ক্বালবে ধীরে ধীরে নূরের সৃষ্টি হবে। নিজের মধ্যে কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলে অবশ্যই নিজ মুর্শিদের নিকট বলবেন। তিনি হয়তো পরবর্তী জিকিরের নির্দেশ দিতে পারেন। এভাবে একটার পর আরেকটা লতীফার জিকির শেষে মুরাক্বাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়ে। তবে সর্বদাই মনে রাখতে হবে ইলমে তাছাওউফ বা ইলমে মা'রিফাত শরীয়তের ভেতরই অবস্থিত। সুতরাং শরীয়তের পাবন্দী একান্ত

জরুরী। শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া উচ্চ পর্যায়ে পৌছা মোটেই সম্ভব নয়।

প্রিয় পাঠক! সবশেষে আমার অনুরোধ, আপনারা এই গুনাহগার বান্দাকে দু'আর সময় স্মরণ করবেন এবং আল্লাহর দরবারে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আমি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় এই পুস্তকটি লিখেছি এবং এটুকু আশা করেছি যে, হয়তো আপনাদের কারো খাস দু'আর ফলে এই গুনাগার বান্দাহ রোজ ক্বিয়ামতের দিন নাজাত পেয়ে যাবে, যেদিন আল্লাহর ভয়ে সবাই ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী! বলতে বলতে বেহুঁশ হয়ে পড়বে।

---------- সমাপ্ত ----------